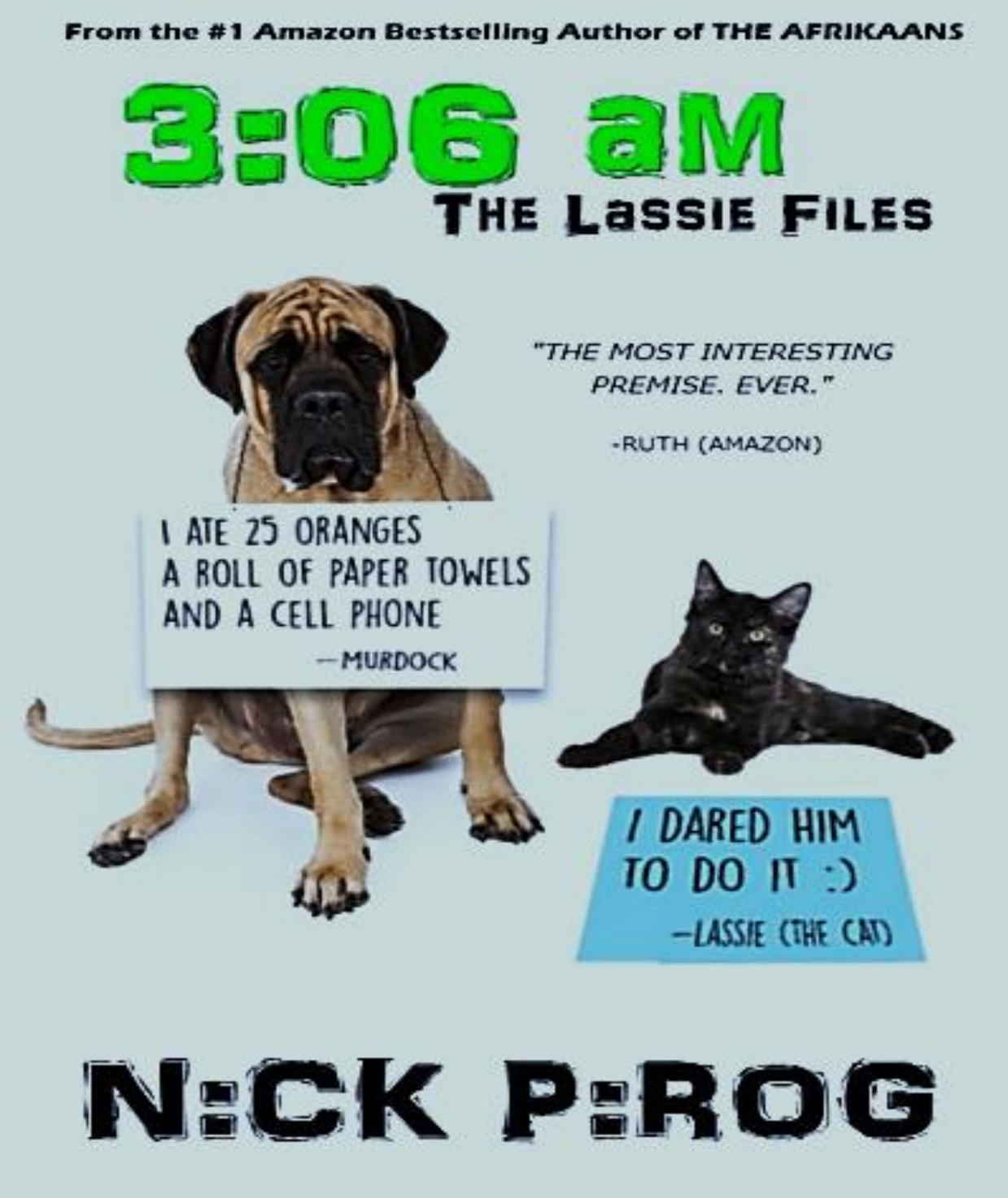

অনুবাদ: নাজমুস সাকিব

এক

তার মুখটা আমার মুখ থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে। তার মুখের টুনা মাছের গন্ধ আমার নাকে ধাক্কা মারল। আমার চিবুকে তার লম্বা গোঁফের স্পর্শ পেলাম। তার হলুদ চোখের মধ্যে লম্বা সবুজ মনি। জানি না, কতক্ষণ ধরে সে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে আমি ঘুম থেকে উঠব বলে।

"কি মিয়া," আমি তার কালো মসৃন লোমে বিলি কাটতে কাটতে জিজ্ঞেস করলাম, "রাতে মজা করেছিস?"

সে মাথা নত করে আমার বুকের দিকে তাকাল।

আমি তার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালাম।

"কি করেছিস?"

মিয়াও।

"রাগবো না?... রাগবো কেন?"

মিয়াও।

"আমি কোন ওয়াদা করতে পারব না।... কি হয়েছে তাই বল।"

মিয়াও।

গতবার যখন ল্যাসি এমন আচরণ করছিল, আমি সেবার বসার ঘরে গিয়ে দেখি তিনটা খরগোশ ছুটাছুটি করছে। সে আমাকে কখনও বলেনি ওগুলো কোথা থেকে এসেছিল।

"দয়া করে বল আবারো খরগোশ না! এ জায়গা থেকে আগেরগুলোর গন্ধ দূর হয়েছে মাত্র।"

মিয়াও।

"তবে কি?"

মিয়াও।

"যদি তুই কিছু না করে থাকিস-" বলতে বলতে আমি থমকে গেলাম। "মারডক কি করেছে?"

বাবার ৬৫তম জন্মদিন উপলক্ষে, আমি তাকে জোর করে লাস ভেগাসের বিশ্ব পোকার চ্যাম্পিয়নশিপে পাঠিয়েছি। তিনি দুইদিন আগে গিয়েছেন, তাই গত

আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে আমাকে তার একশত ষাট পাউন্ড ওজনের বৃটিশ মাস্টিফ কুকুরটার দেখাশোনা করতে হচ্ছে।

আমি ল্যাসিকে সরিয়ে উঠে বসলাম। "সে কি ইসাবেলের সাথে কিছু করেছে?"

ইসাবেল হল আমার ঝাড়ুদার কাম ব্যাক্তিগত পাচক কাম সহকারী কার্যসম্পাদক। সে আমার একঘণ্টার সর্বোচ্চ ব্যাবহার করতে যথাসাধ্য সাহায্য করে। গতকাল ঘুম থেকে উঠে আমার বিছানার পাশে টেবিলে একটা নোট পাই। সে কোনকারনে এতই অন্যমনস্ক ছিল যে, সে নোটটা স্প্যানিশ ভাষায় লিখেছে।

ইসাবেলের কাছ থেকে গত ছয় বছর ধরে আমি সামান্য স্প্যানিশ শিখেছি, কিন্তু তার লেখা বুঝতে পারার মত জ্ঞান আমার নেই। আমি এটা ইন্টারনেটে অনুবাদ করলাম। মূল কথা হল, সে বলেছে যে মারডক তাকে যৌন হয়রানি করেছে।

আমি ঘোড়ার সমান মারডকের নিচে সুন্দরী মেক্সিকান রমণীকে কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম।

পুরাই দৃষ্টিকটু।

ইসাবেল আবার আসলে যদি মারডক তার বিশ ফুটের ভেতর যায়, তবে তাকে খোঁজা করে দেব বলে শাসিয়েছিলাম।

"সে কি ইসাবেলের সাথে কিছু করেছে?" আমি আবারো বললাম। আমার গায়ের উপর থেকে চাদর সরালাম। আমি এখনও গতকালের পোশাক পরে আছি: ধূসর রঙের প্যান্ট আর কালো টিশার্ট।

ঘড়িতে বাজে তিনটা এক।

তার জবাবের জন্য অপেক্ষা করলাম না।

আমি ঝড়ের বেগে বেডরুম থেকে ড্রইংরুমে আসলাম।

মারডক সোফার সামনে শুয়ে আছে। তার শরীর যেন কার্পেটের সাথে মিশে আছে। আমি আসতে সে চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তার বিশাল চোখদুটো চকচক করছে। তার নিচের চোখের পাতা নুয়ে পড়েছে।

আমার সকল রাগ জল হয়ে গেল।

আমি হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসে তার ছোট কালো লোমে হাত বুলালাম। "কি হয়েছে মিয়া?"

সে নড়ল না।
আমি দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালাম সে কি অঘটন ঘটিয়েছে দেখার জন্য। কিন্তু মনে হচ্ছে সবকিছুই ঠিক আছে।
“কি হয়েছে?” আমি ল্যাসিকে জিজ্ঞেস করলাম। সে এখন সোফার উপর বসে আছে। “মারডক কি করেছে?”
ইসাবেল যেখানে সাবান-সোডা রাখে সেখান দেখলাম। আলমারির উপরের তাকে সেগুলো ঠিকভাবেই আছে। আমি রান্নাঘরে গেলাম। ফ্রিজ খুললাম। ইসাবেল আমার জন্য খাবার প্রস্তুত করে পিনাট বাটারের পাশে সাজিয়ে রেখেছে।
“সে কি খেয়েছে?” আমি চিৎকার করে ল্যাসির কাছে জানতে চাইলাম।
সে শ্রাগ করল।
আমি সবগুলো আলমারি খুলে দেখলাম, কিন্তু কিছুই হারায় নি।
সম্ভবত মারডক অসুস্থ।
এটা হতেই পারে, তাই না?
তবে ল্যাসি কেন বলল আমি যেন রাগ না করি?
তখনই আমি দেখতে পেলাম।
প্রমাণ।
আমি ঝুঁকে পড়লাম আর এক ইঞ্চি কমলার খোসা তুললাম।
কাউন্টারের উপর থাকা এক ব্যাগ কমলার আর মাত্র এতটুকুই অবশিষ্ট আছে। বলাই বাহুল্য, ইসাবেল কসটকো থেকে আমার জন্য এক ব্যাগ কমলা নিয়ে এসেছিল।
আমি হতাশ হয়ে মাথা ঝাঁকালাম।
মারডক নির্বোধ হতে পারে। কিন্তু সে এতটা নির্বোধ নয় যে পঁচিশটা কমলা খেয়ে ফেলবে।
ল্যাসি সোফার উপর স্থির হয়ে বসে আছে। আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম।
“তুই তাকে একাজে চ্যালেঞ্জ করেছিস, তাই না? তুই তাকে বলেছিস সে সবগুলো কমলা খেতে পারবে না?”
মিয়াও।

“তুই ভেবেছিলি সে একাজ করবে না! তুই তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিস আর সে করেনি এমন কোন ঘটনা আছে নাকি? যেবার তুই তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলি দাদার বাড়ির পেছনের উঠানের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে তখন সে কি করেছিল? সে তিন ঘণ্টা ধরে বেড়ার ফাঁকে আটকে ছিল। যেবার তুই তাকে স্কাঙ্কদের (ভোদড়ের মত প্রাণী) তাড়া করার চ্যালেঞ্জ করলি, সে কি তা করেছিল, আর তা করতে যেয়ে আমার বাবার নব্বই ডলারের টমেটো সসের ক্ষতি করেছিল? সে তোকে খুশি করার জন্য সবকিছু করবে।”

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। “প্লিজ, বল সে শুধু ওগুলোই খেয়েছে।”

মিয়াও।

“তোর মনে নেই?”

মিয়াও।

“তোর মনে হচ্ছে সে এক রোল টয়লেট পেপার খেয়েছে না তুই জানিস?”

মিয়াও।

“তুই ভেবেছিলি এটা কমলাগুলো শুষে নেবে?”

মিয়াও।

“সর্বনাশ। আর কিছু?”

মিয়াও।

“পঁচিশটা কমলা আর পুরো এক রোল টয়লেট পেপার। সর্বনাশ ল্যাসি। সে সম্ভবত মারা যাবে।”

আমি বেডরুমে ছুটে গেলাম।

বাবাকে ফোন করতে হবে।

বিছানার পাশের টেবিল হাতলালাম। বিছানার নিচে চেক করলাম। বিছানার চাদর তুলে ঝাড়লাম। কোথাও ফোন নেই।

“ল্যাসিইইইই!”

আমি একছুটে ড্রয়িং রুমে ফিরে এলাম।

“আমি তোকে এই শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি।” আমি লম্বা করে শ্বাস নিলাম। “তুই কি তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলি–”

আমার শেষ করা লাগল না।
গেম অফ থ্রোনসের থিম বাজা শুরু হয়েছে।
এটা আমার বাবার রিংটোন।
আর শব্দটা আসছে মারডকের পেট থেকে।

দুই

“তোকে হাঁটতে হবে সোনা,” আমি দশমবারের মত কথাগুলো বললাম। “তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।”

মারডক আক্ষরিকভাবে আমার দিকে মাথা ঝাঁকাল।

সে নড়ছে না।

তার অবস্থা পুরোটায় শোচনীয়।

হবে নাই বা কেন? তার পেটের মধ্যে পুরো দশ পাউন্ড কমলা, এক রোল টয়লেট পেপার আর একটা স্যামস্যাং গ্যালাক্সি ফাইভ ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।

আমি তার সামনের পা ধরে তাকে টেনে নেয়ার চেষ্টা করলাম।

আমি তাকে এক ইঞ্চিও সরাতে পারলাম না।

“আহ্।”

আমি লম্বা করে শ্বাস নিলাম।

এরকম অবস্থাতেই প্রতিবেশীদের দরকার পড়ে। কিন্তু নিচ তলার যুবক ছেলে যাকে আমি প্রায়ই গোপনে বাসায় ফিরতে দেখি, আর পাশের বাসার বৃদ্ধা মহিলা যে মাঝে মাঝে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়; তাদের বাদে বিগত আট বছরে আর কারো সাথে আমার দেখা হয়নি।

আমি তিন ব্লক দূরে যেয়ে পে ফোন দিয়ে ইনগ্রিডকে ফোন করার কথা ভাবলাম।

আমরা গত তিনমাস ধরে প্রেম করছি। কিন্তু আলেক্সান্ড্রা হোমিসাইডের গোয়েন্দা হিসেবে তার ব্যস্ততার জন্য আসল সময়টা হলো কুড়ি ঘণ্টা। তাকে এই সমস্যার কথা বলা উচিত হবে কিনা তা আমি নিশ্চিত না।

তাছাড়া, মারডককে দুজন মিলেও এতগুলো সিঁড়ি বেয়ে নামাতে পারব কিনা সন্দেহ।

এমন কোন উপায় বের করতে হবে যেন মারডক নিজে নিচে নেমে গিয়ে আমার বাবার লিঙ্কনে উঠে।

পরের কয়েক মিনিট ধরে যা মাথায় আসল তার সব চেষ্টা করলাম।

আমি তাকে টার্কি দিয়ে প্রলোভন দেখালাম।

আমি তাকে হাড় দিয়ে প্রলোভন দেখালাম।

আমি তাকে পাঁচশ ডলারের প্রলোভন দেখালাম।
সে যেন আমার ড্রয়িং রুমে মরার পণ করেছে।
সে আমার দিকে তাকিয়ে কোঁকাতে শুরু করল।
আমি তাকে আগে কখনো কোঁকাতে শুনিনি।
এটা হৃদয়বিদারক।
“আমি দুঃখিত, সোনা।”
তখনই ব্যাপারটা আমার মাথায় আসল।
আমি বেডরুমে ছুটে গেলাম। আলমারি খুলে তার একটি ড্রয়ার খুললাম। আমি ল্যাসির হলুদ ঝুনঝুনি বল বের করলাম। ড্রয়িং রুমে ফিরে এসে আমি মারডকের দিকে বলটি ধরে ঝাঁকিয়ে বললাম, “দেখতো কি এনেছি।”
তার চোখ বলের দিকে নিবদ্ধ হলো।
তার কান নড়তে লাগল।
তার লেজ সোফার সাথে বাড়ি খেতে শুরু করল।
প্রথমবার যখন মারডক ল্যাসির হলুদ বলটা দেখেছিল সে পুরো পাগল হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল তার উপর ভূতে ভর করেছে। সে ল্যাসির দামি সম্পত্তিটাকে তাড়া করতে গিয়ে দুটি ল্যাম্প, একটা ডাইনিং চেয়ার ভেঙ্গে ফেলেছিল আর দেয়াল থেকে তিনটি ছবি ফেলে দিয়েছিল। তারপর থেকেই আমি ল্যাসির কথামতো মারডক আসলেই বলটাকে সিন্দুকবন্ধ করে রাখি।
ল্যাসি সোফার উপর থেকে আমার দিকে তাকাল।
মিয়াও।
“তোর কি মনে হয় আমি কি করছি? আমি তোর বেস্ট ফ্রেন্ডের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছি। তুই বেছে নে – মারডক নাকি তোর ফালতু বল।”
মিয়াও।
“বল? তুই বল বেছে নিচ্ছিস।” আমি ব্যাঙ্গ করে বললাম। “তুই শুনেছিস, মারডক? তুই মরে গেলেও ল্যাসি তোকে তার বল নিয়ে খেলতে দেবে না।”
মারডক একটি শব্দও শোনেনি। তার চোখ রক্তবর্ণ। আমার হাতে থাকা বলই একমাত্র জিনিস যার মূল্য আছে। এটাই তার পৃথিবী।

আমি বলটা তার সামনে দোলালাম আর বললাম, “ধর।”
সে লাফিয়ে উঠল।
দুই মিনিট পর, আমরা তিনজনই আমার বাবার গাড়িতে গাদাগাদি করে উঠে পড়লাম।

#

জরুরি পশুচিকিৎসক একমাইলের মধ্যে বসেন। চারমাস আগে যেবার ল্যাসি সজারুর কাছে মার খেয়েছিল আমি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য সেবার আমার ভ্যাসপায় ল্যাসিকে একটা ব্যাকপ্যাকের মধ্যে করে নিয়ে গিয়েছিলাম।
খোদাকে ধন্যবাদ, বাবা লিঙ্কনটা রেখে গেছে।
আমি গাড়িটা পার্কিং করলাম। সেখানে আগে থেকেই একটা গাড়ি ছিল, নীল রঙের পুরনো শেভী ট্রাক।
আমার ইচ্ছা ছিল ঝুনঝুনি বলের জাদু দিয়ে মারডককে গাড়ি থেকে নামিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু আসার পথে মাঝরাস্তায় সে পেছনের সিট থেকে আমার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর একটু হলেই বিদ্যুতের খাম্বার সাথে গাড়ির এক্সিডেন্ট হচ্ছিল। তাই আমি তাকে বলটি দিয়ে দিতে বাধ্য হই।
ল্যাসি মহাআতঙ্কের সাথে দেখল যে, মারডক তার সাধের বলটা পুরো গলাধকরণ করেছে।
আমি দরজা খুলে মারডককে বের করার চেষ্টা করলাম।
সে নড়ছে না।
আমি ঘুরে অন্যপাশে গেলাম। তারপর আমার দুই হাত দিয়ে সর্বশক্তিতে তাকে ঠেলতে লাগলাম। ইঞ্চি ইঞ্চি করে সে কালো লেদারের সিটের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলল। অবশেষে সে ধপাস করে রাস্তার উপর পড়ল।

আমি দৌড়ে আসলাম।
মারডকের অর্ধেক গাড়ির ভেতরে আর অর্ধেক বাইরে।
“সোনা।”
আমি তার সামনের পা ধরে টানতে আরম্ভ করলাম। অবশেষে তাকে সম্পূর্নভাবে গাড়ি থেকে নামাতে সক্ষম হলাম।
ল্যাসি গাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।
“তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।”
সে কিছু বলল না। তার বল মারডককে দেয়ায় সে আমার উপর রেগে আছে।
আমি লম্বা করে শ্বাস নিয়ে নিচু হলাম। এখান থেকে ডাক্তারখানার দরজা মাত্র কুড়ি ফুট। আমি তাকে তুলে নিতে পারব।
আমি তার একদম উপরে দাঁড়ালাম যেন আমরা একই দিকে মুখ করে থাকি। আমি নিচু হয়ে তার সামনের পায়ের নিচ দিয়ে আমার হাত ঢুকিয়ে বুকের চারপাশে জড়িয়ে ধরলাম। আমি প্রতি সপ্তাহে চার-পাঁচবার ছয়মিনিট ধরে ওজন তুলি। এটা এমন কিছুই না, কিন্তু আমি একসেকেন্ড সময়ও নষ্ট করি না। দিনে তেইশ ঘণ্টা ঘুমের পরে মাসল বানানো খুবই কঠিন, কিন্তু গত আট বছর ধরে আমার প্রতি বছর এক পাউন্ড করে ওজন বেড়েছে। আমি শামুক না। তবুও তোলা- তারপর টানা- তারপর ছাড়া, তোলা-টানা-ছাড়া এভাবে মোট সাতবারের পর আমি তাকে নিয়ে কুড়ি ফুট দূরে ছোট লাল দালানের কাঁচের দরজার কাছে নিয়ে পৌঁছুতে সক্ষম হলাম।
আমি যতবার তাকে ছাড়ছিলাম – আর ল্যাসি মহাআতঙ্কে দেখছিল – সে ঝুনঝুন করছে।
আমি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। নীল এপ্রন পরা একজন মেয়ে ডেস্কের পেছনে বসে আছে। আমি নিঃশ্বাস নিতে খাবি খাচ্ছি, তাও কোনমতে বললাম, “হেই, আপনি এসে দরজাটা একটু ধরে রাখবেন?”
সে তাকাল, তারপর ডেস্কের পাশ দিয়ে ঘুরে আসল। তার বয়স পঁচিশের বেশি হবে না। বাদামী চুল ছোট করে ছাটা। নীল চোখ। কোন মেকআপ নেই। তার বুকের বামদিকে সাদা নেমট্যাগ ঝুলানো। তার নাম ক্যানডেস।

ক্যানডেস দরজা ধরে রাখল।
“ওহ, ম্যান,” মারডককে দেখে সে বলে উঠল।
আমি নিচু হয়ে তাকে দরজা দিয়ে টেনে ভেতরে ঢুকালাম, তারপর ছোট ওয়েটিং রুমের লিনোলিয়ামের মেঝেতে নামিয়ে রাখলাম।
ক্যানডেস নিচু হয়ে মারডককে খোঁচা মারল। “ওর কি হয়েছে?”
আমি কথা বলতে পারছি না। আমি খুবই ক্লান্ত।
আমি পাঁচ ছয়বার লম্বা শ্বাস নিলাম, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। দুরের দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালাম।
৩:১৬ এ.এম।
“সে একগাদা জিনিস খেয়েছে,” আমি ব্যাখ্যা করলাম। “পঁচিশটা কমলা, এক রোল টয়লেট পেপার, একটা মোবাইল আর একটা ঝুনঝুনি বল।”
সে আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালো।
আমি তার দিকে ভাল করে তাকালাম। সুন্দর নীল চোখ। সে আসলেই আকর্ষণীয়। অনেকটা ছেলেদের মত দেখতে, কিন্তু আসলেই সুন্দরী। ইনগ্রিডের মত না যদিও, কিন্তু ওরকম আর কজনই হয়।
“ডাক্তার এখন একজন রোগীর সাথে আছেন, কিন্তু আমরা দ্রুতই তাকে দেখতে পারব।” সে উঠে দাঁড়াল তারপর ঘুরে ডেস্কের ওপাশে গেল। “ওর নাম কি?”
“মারডক।”
“সে কি আগে এখানে এসেছে?”
“না, কিন্তু আমি এসেছি।”
সে কম্পিউটারে আমার তথ্য খুঁজতে লাগল।
“আহ ল্যাসি। ধরে নিচ্ছি এই বেড়ালটা।”
ল্যাসি কাউন্টারে উঠে পড়েছিল আর এখন ক্যানডেসের কোলে উঠছে।
শয়তানটা আর ভাল হবে না।
আমি মাথা ঝাঁকালাম।
“ওকে, আর একটু সময় অপেক্ষা করুন, ডাক্তার ফ্রি হলেই আমরা আপনাকে ডাকব।”

আমি মাথা ঝাঁকালাম আর তারপর পানির পাত্রের কাছে গেলাম। আমি তিন গ্লাস পানি খেলাম তারপর মারডকের কাছে এক গ্লাস পানি নিয়ে আসলাম।
সে একচুমুক পানি খেল, তারপর গুঙিয়ে উঠে বিশাল থাবার ওপর মাথা রাখল।
আমি আবার ঘড়ির দিকে তাকালাম।
৩:১৮ এ.এম।
আমি আর বেয়াল্লিশ মিনিট জেগে থাকব। এখান থেকে বাসায় গিয়ে বিছানায় শুতে আমার ছয় মিনিট লাগবে, তার মানে ৩:৫৪ এ.এম.-এর মধ্যে আমাকে গাড়ির মধ্যে ঢুকতে হবে। আমার মনে ক্ষীণ আশা আছে যে, তার আগেই ডাক্তারের মারডককে দেখা শেষ হবে। তাকে সারারাতও রাখতে হতে পারে।
"আমার পক্ষে অতক্ষণ থাকা হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে। আমি কি আজ রাতের জন্য ওকে আপনার কাছে রেখে যেতে পারি?"
"অবশ্যই। আমরা তাকে দেখে আপনাকে জানাব যে কি করতে হবে। আপনি শুধু যাওয়ার আগে আপনার ক্রেডিট কার্ড নাম্বার রেখে যান।"
যা সে বলল না তা হল, আপনি কিভাবে অটোশপে গাড়ি রাখার মত আপনার পোষা প্রাণী ফেলে রেখে যাচ্ছেন?
"প্রেসিডেন্টের সাথে আমার একটা মিটিং আছে," আমি মিথ্যা কথা বললাম।
সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রেসিডেন্ট কনর সুলিভান আমাকে যে কার্ড দিয়েছেন সেটি বের করে তাকে দেখালাম।
যদি সে বিস্মিতও হয়ে থাকে তার আচরণে তা প্রকাশ পেল না। "ওহ্, হ্যাঁ, আমরা তাকে এখানে রেখে দেব। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।"
আমি মাথা ঝাঁকালাম।
"আমি কি আপনার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?" আমি মারডকের দিকে দেখিয়ে বললাম, "ও আমারটা খেয়ে ফেলেছে।"
ক্যানডেস হেসে ফেলল।
কুকুরে কি না খাই, তাই না?
সে টেলিফোনটা কাউন্টারে উঠিয়ে দিল। কাউন্টারের উপর একটা নোটিশ পড়ে আছে। তাতে লেখা, "আপনি যদি ইয়েল্পে আমাদের উপর একটা রিভিউ লেখেন

তবে ১০ ডলার ছাড়।”
মনে থাকবে।
আমি বাবাকে ফোন করলাম।
তৃতীয়বার রিং হওয়ার পর তিনি ফোন ধরলেন।
“বাবা।”
“হেনরি? এটা কার নাম্বার?”
“আমি পশু হাসপাতাল থেকে বলছি। মারডক আমার মোবাইল খেয়ে ফেলেছে।”
“ক্রাপপোলা।” ক্রাপপোলা হলো আমার বাবার বিশেষ গালি।
“আর হ্যাঁ, সে সাথে আরো বেশ কিছু জিনিস খেয়ে ফেলেছে।” আমি তাকে বললাম।
“বেচারা।”
“তার অবস্থা পুরোপুরি ভাল নয়, কিন্তু সে ঠিক হয়ে যাবে।” আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য ক্যানডেসের দিকে তাকালাম। সে আমাকে হাসি দিয়ে বা বৃদ্ধাঙ্গুল তুলে আশ্বস্ত করল না। সে এখন ল্যাসিকে আদর করতে ব্যাস্ত। ল্যাসি কিভাবে যেন একটা থাবা তার গলায় তুলে দিয়েছে।
“হ্যাঁ, আমি আর ত্রিশ মিনিট এখানে থাকতে পারব।”
“হ্যাঁ। আমি প্রতিযোগিতা থেকে একরকম বাদই বলা যায়। আমি পরের ফ্লাইটেই আসছি। পশু হাসপাতালের ঠিকানাটা কি?”
আমি কাউন্টার থেকে একটা কার্ড নিয়ে তাকে ঠিকানাটা বললাম।
আমি তাকে বললাম ডাক্তার তাকে ফোন করে মারডকের অবস্থা জানাবে। আমি তাকে আরো জানালাম যে আমি তাদেরকে আমার ক্রেডিট কার্ডের তথ্য জানাচ্ছি আর তারা প্রয়োজনীয় সবকিছুই করবে।
“আমি কি তার সাথে একটু কথা বলতে পারি?”
আমি ফোনের নিচের অংশটাকে কাউন্টারের একদম কোনায় সরিয়ে আনলাম। তারপর ফোনটা মারডকের কানের কাছে ধরলাম।
বাবা কি বলছে আমি শুনতে পারলাম না, কিন্তু বাবার কণ্ঠ কানে যাওয়া মাত্রই মারডক ঘেউঘেউ শুরু করল। দশ সেকেন্ড পর ফোনটা ফিরিয়ে নিলাম, “...তোর

জন্য একটা বড় মাংসের টুকরা আর সংবাদ...”
দরজা খুলে গেল আর হলওয়ে থেকে কথা ভেসে আসতে লাগল।
“শুন বাবা, এখন রাখি।”
“ঠিক আছে, এসে তোর সাথে কথা হবে।”
আমি ফোনটা রাখতে না রাখতেই একজন দৈত্যাকার মানুষ ঘরে ঢুকল। তার পায়ে বুট জুতা, পরনে জিনসের প্যান্ট আর কালো রঙের একটা টিশার্ট যাতে লেখা রয়েছে জল্লাদ। তার মাথা মুড়ানো। লালচে-খয়েরি রঙের বিশাল গোঁফ তার চেহারায় ভারিক্কি এনে দিয়েছে। এখন মুটিয়ে গেলেও তার পেশিতে যৌবনবয়সের শক্তির আভাস রয়েছে। তার হাতে অনেকগুলো ট্যাটু আঁকা যা কালের বিবর্তনে ঝাপসা হয়ে গেছে। তার বাম বাহুতে কালচে-হলুদ রঙের একটা সাপ পেঁচিয়ে রয়েছে।
যদি আপনি ইন্টারনেটে “সর্পমানব” লিখে সার্চ দেন, এই লোকের ছবি চলে আসলেও আসতে পারে।
“সাতশ ডলার?” লোকটি চেঁচিয়ে বললেন, “সাতশ ডলার? আমার কাছে অত টাকা নেই।”
হলওয়েতে আরেকজন লোককে দেখা যাচ্ছে। পরনে সাদা কোট। চোখে চশমা। ডাক্তার। ল্যাসিকে যিনি দেখেছিলেন তিনি নন, আরেকজন। তার কালো চুল ছোট করে ছাঁটা। কপালের দুই দিকে টাক পড়তে শুরু করেছে। ক্লিনসেভ করা মুখ। মোটামুটি আমারই বয়সী।
“আমার কিছুই করার নেই।” ডাক্তার শান্তস্বরে বললেন। “আমাদের এখানের নিয়ম হল, সেবা নেয়ার সময়ই মূল্য পরিশোধ করতে হবে।”
“বাজে নিয়ম।”
“আমরা ক্রেডিট কার্ডও নেই।”
“আমার ক্রেডিট কার্ড নেই।”
“সম্ভবত আপনি কাউকে ফোন করতে পারেন যিনি আপনাকে টাকা ধার দিবেন।” ক্যানডেস প্রস্তাব দিল।
সর্পমানব উপহাসের স্বরে বললেন, “আমার পরিবারের সবাই প্রিন্সেসকে ঘৃণা করে।”

কিলার না, ক্রাশার না, হ্যানিবাল না, ক্রাকেন না, ভলডেমর্ট না, সাপের নাম রেখেছে প্রিন্সেস।
আমি হেসে ফেললাম।
সর্পমানব আমার দিকে মেলে তাকালো। তার চোখ থেকে যেন আগুন বের হচ্ছে। লাল টকটকে চোখ। কান্নাকাটির জন্য চোখ লাল না কি নেশার জন্য জানি না।
সে আমার দিক থেকে নজর সরিয়ে সাপের দিকে তাকাল। প্রিন্সেসের দিকে। সর্পমানব এখন একটু শান্ত হয়েছে বলে মনে হল। তার নিচের ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সে সশব্দে ঢোঁক গিলল, তারপর জিজ্ঞেস করল, "কোনধরনের কিস্তির ব্যবস্থা করা যায় না? ধরুন, প্রতি মাসে একশ ডলার করে শোধ করলাম?"
"আমি দুঃখিত," ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, "আমাদের এখানে কিস্তির কোন ব্যবস্থা নেই।"
এটা আসলেই সত্য কি না আমার জানা নেই। না কি শুধুমাত্র তারমত লোককেই তারা কিস্তি দেয় না।
সর্পমানবের মাথা নিচু হয়ে গেল, তারপর সে দুদিকে মাথা ঝাঁকাতে লাগল।
আমি মারডকের দিকে তাকালাম। যদি আমি তাকে সাহায্য করতে না পারতাম? আমি ল্যাসির দিকে তাকালাম, যে এখন কাউন্টারে বসে এক দৃষ্টিতে প্রিন্সেসের দিকে তাকিয়ে আছে। সন্দেহ নেই, কিভাবে ওকে পটানো যায় সে চিন্তাই করছে।
এর পরের বার যদি ল্যাসি একদল ক্ষেপা পোসামের কাছে পিটুনি খায়, আর আমার কাছে যদি তাকে ডাক্তার দেখানোর মত টাকা না থাকে?
আমি সর্পমানবের কাঁধে আলতোভাবে হাত রাখলাম "শুনুন, টাকাটা আমি–"
"আমার গায়ের উপর থেকে হাত সরা," সে মাথা তুলে গর্জন করে উঠল।
আমি দু পা পিছিয়ে গিয়ে দুহাত উপরে তুললাম।
"সরি ভাই, আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম–"
"কি বলতে চাচ্ছিলেন? এটাই যে আমি গরিব। আমার একটা চাকরি করা উচিৎ।"
সে আমাকে বাম হাত দিয়ে ধাক্কা মারল, প্রিন্সেস নামের সাপটা আমার মুখ থেকে বড়জোর ইঞ্চিখানেক দূরে। সাপটা জিহবা বের করে হিসিয়ে উঠল। আমার মনে হয় সাপটা লম্বায় চার-পাঁচ ফুট হবে।

সর্পমানব হিসিয়ে উঠে বলল, “মন চাচ্ছে ওই শালার ছোট বেড়ালটা তোর গুয়ায় ঢুকিয়ে দেই।”
“স্যার,” ডাক্তার মধ্যস্থতা করে বললেন, “স্যার, আপনি বেরিয়ে গেলে খুশি হব।”
“ফাক ইউ,” সে গর্জন করে উঠল।
ক্যানডেস দাঁড়িয়ে ফোন তুলে নিল।
সর্পমানব এটা দেখে নিজেকে সামলে নিল। সে দরজার দিকে ঘুরল।
মারডক অল্প একটু মাথা তুলে প্রিন্সেসকে দেখল, তারপর সে কর্কশস্বরে গর্জে উঠল।
“ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি,” সর্পমানব যেতে যেতে বলল, তারপর ঘুরে দাঁড়ালো। যে হাতে প্রিন্সেস শক্তভাবে জড়ানো আছে, সেহাত নেড়ে সে ডাক্তার আর ক্যানডেসের উদ্দেশ্যে বলল, “আমি ইয়েল্লে এব্যপারে অবশ্যই লিখব।”

তিন

ডাক্তারই প্রথমে সামলে নিলেন। তিনি আমার দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। তার নাম ডা. ইভান্স। তিনি ঝুঁকে মারডককে পরীক্ষা করতে লাগলেন। আর আমি মারডক কি কি খেয়েছে তার বর্ননা দিতে লাগলাম।

"তুমি ওসব খেয়েছ," তিনি মারডককে আদর করতে করতে বললেন, "তোমার খারাপ লাগছে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, "এক্সরে করতে হবে, তাহলে জানা যাবে সবকিছু কোথায় আছে, তাহলে কোথায় খুঁজতে হবে সহজেই জানতে পারব। বেশিরভাগ সময়, অপেক্ষা করলেই ঠিক হয়ে যায়, এগুলো এমনিতেই বেরিয়ে যাবে।"

"আপনি বলতে চাইছেন, সবকিছু পায়খানার সাথে বেরিয়ে আসবে?"

তিনি হাসলেন। "অথবা বমির সাথে। কিছু ঔষধ আছে, যেটা খেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে আর তার পেটের মধ্যেও ভাল লাগবে। অথবা কে জানে, হয়তো আমাদের এক্সরে দেখে অপারেশনের মাধ্যমে নিজেদেরই বের করতে হতে পারে।"

আমি মাথা ঝাঁকালাম, তারপর ঘড়ির দিকে তাকালাম।

৩:২৩ এ.এম।

ডাক্তার এবং ক্যানডেস মারডকের জন্য স্ট্রেচার আনতে চলে গেলেন।

আমি নিচু হয়ে মারডককে আদর করলাম। "ভাল ডাক্তার। তুই ঠিক হয়ে যাবি।"

সে আমার হাত চেটে দিল।

"খচ্চর বেড়ালটা আবার কোথায় গেল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ল্যাসি কাউন্টার থেকে এক লাফে আমার সামনে এসে পড়ল।

"এইতো।"

মিয়াও।

"তোর জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আমি তামাশা করছিলাম। আমি জানি তুই গে না। আলেক্সান্ডার অর্ধেক খরগোশ এটা জানে।"

মিয়াও।

"না, আমি বলছি না এতে কোন সমস্যা আছে।"

ডাক্তার এবং ক্যানডেস ফিরে এল। আমি আর ডা. ইভান্স মিলে মারডককে

স্টেচারে উঠালাম, তারপর তাকে ঠেলে হল দিয়ে একটা রুমে নিয়ে গেলাম। রুমে একটা বিশাল এক্সরে মেশিন বসানো।
ডা. ইভান্স মারডককে এক্সরে বেডে উঠালন।
মারডক গুঙিয়ে উঠল।
“আমি জানি এটা ঠান্ডা। মাত্র এক মিনিট লাগবে।”
আমি দেখলাম তিনি এক্সরে চালু করলেন।
“ওই লোকের সাপের কি হয়েছে,” আমি জিজ্ঞেস করলাম।
ডা. ইভান্স লম্বা করে শ্বাস নিলেন। আমার মনে হল তিনি বলবেন, “আমি অন্যলোকের পোষা প্রাণীর কি হয়েছে আপনাকে বলতে পারব না,” কিন্তু হয় ওরকম কোন নিয়ম নেই, আর যদি থেকেও থাকে, ডা. ইভান্স ওসবে অতটা গুরুত্ব দেন না। “তার পেটে ডিম। আপনি হয়তো লক্ষ করেননি, কিন্তু তার লেজের কাছে একজায়গায় উঁচু হয়ে ছিল। তার একটা ডিম হয় খুব বড় অথবা বিকলাঙ্গ। এটা বাঁধার সৃষ্টি করেছে।”
“তারমানে, সে গর্ভবতী?”
তিনি মাথা ঝাঁকালেন।
“তারমানে লোকটি ওকে অন্য সাপের সাথে মিলিত করাচ্ছিল?”
“নিশ্চিত না, তবে সম্ভবত।”
“তারপর? ওগুলো কি অপারেশন করে বের করতে হয়?”
“সাধারণত, আপনার কুকুরটির মতই, নিজে থেকেই সেরে যায়। কিন্তু প্রিন্সেসের ক্ষেত্রে ব্যপারটা গুরুতর। যদি ডিমগুলো দ্রুত বের করা না হয়, সে সম্ভবত বাঁচবে না।”
তিনি অপর হাতটি এক্সরের কাছে নিয়ে গেলেন। “প্রায় হয়ে গেছে,” মারডকের কান চুলকে দিতে দিতে তিনি বললেন।
তিনি একটু থামলেন তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি আসলেই দিতেন?”
“কি দিতাম?”
“আপনি কি বলছিলেন আমি শুনেছি। ও পাগলামি শুরু করার আগে আপনি ওর

চিকিৎসার খরচ দিতে চাচ্ছিলেন?”
“ঝোঁকের মাথায় অনেকসময় আমরা অনেককিছু করি এটা অমনই এক ঘটনা,” আমি শ্রাগ করলাম, “ভেবে চিন্তে বলি নি। সে যেভাবে সাপটার দিকে তাকাচ্ছিল দেখে ভাবলাম, করি না সাহায্য?”
গত আট বছর ধরে অনলাইন শেয়ারবাজারে আমি কয়েক মিলিয়ন ডলার কামিয়েছি। দৈনিক আমার হাতে মাত্র এক ঘণ্টা থাকায় আমি এ টাকার খুব সামান্য অংশই খরচ করতে পেরেছি।
“এটা আপনার মহানুভবতা। যদি সে শুনতে পেত।”
“আমার মনে হয় সে চোখে অন্ধকার দেখছিল।”
ডাক্তার হাসলেন।
“ঠিক আছে, হয়ে গেছে। আপনি বিড়ালটাকে নিয়ে একটু বাইরে অপেক্ষা করেন।”
আমি ল্যাসিকে তুলে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে আসলাম। আমার পিছনে ডাক্তার দরজা বন্ধ করে দিলেন। একটু পর হালকা গুঞ্জন ভেসে এল। তিনবার এমন হালকা গুঞ্জন হওয়ার পর, ডাক্তার দরজা খুলে বললেন, “হয়ে গে–”
হলওয়ে থেকে তীক্ষ্ম চিৎকার ভেসে এল।
ল্যাসি লাফ মেরে আমার হাত থেকে নেমে গেল। ডা। ইভান্স আর আমি দৌড়ে ওয়েটিং রুমে গিয়েই ব্রেক করে থেমে গেলাম। সর্পমানব রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাম হাতে এখনো প্রিন্সেস শক্তভাবে পেঁচিয়ে আছে। তার ডান হাতে একটি কালো বন্দুক শোভা পাচ্ছে।
সর্পমানব ক্যানডেসের বুকের উপর থেকে বন্দুকটি সরিয়ে ডা. ইভান্স আর আমার মাঝামাঝি জায়গা বরাবর তাক করে ধরল।
“নড়বি না,” সে হুমকি দিল।
আমি নড়ার সাহস পেলাম না।
“টেলিফোনের তার খুলে ফেল,” সে চিৎকার করে ক্যানডেসকে বলল।
সে তার খুলতেই সে বলল, “ফোন মেঝেতে ছুড়ে ফেল।”
সে হাতির দাঁতের তৈরি বিশাল ফোনকে ধাক্কা দিতেই এটি মেঝেতে পড়ে গেল।
“তোদের মোবাইলগুলো দে,” সে চেঁচিয়ে বলল।

ডা. ইভাঙ্গ আর ক্যানডেস তাদের মোবাইল বের করল।
“মেঝেতে ফেলে দে।”
তারা মোবাইলগুলো মেঝেতে ফেলে দিল।
সে মোবাইলগুলো তুলে তার জিন্সের পিছনের পকেটে ঢুকালো।
“তোরটা কই?” সে আমার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল।
“আমার কাছে কোন মোবাইল নেই।”
“ফালতু কথা।”
“না, সত্যি। আমার সাথে যে কুকুরটা রয়েছে সে খেয়ে ফেলেছে।”
সে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডাক্তারের দিকে তাকালো।
ডা. ইভাঙ্গ বললেন, “আমি এখনো এক্সরে রিপোর্ট দেখিনি, কিন্তু সে এসে এটাই বলেছিল।”
“এখানে আয়,” সে নির্দেশ দিল।
আমি পাঁচ কদম সামনে বাড়লাম।
সে আমার বুক বরাবর বন্দুক ধরে রেখেছে।
“পকেট বাইরে বের কর।”
আমি আমার সব পকেট বের করলাম। আমি তাকে আমার মানিব্যাগ আর গাড়ির চাবি দেখালাম।
সে ওগুলো তাকে দিতে বলল।
আমি দিলাম।
সে আমার মানিব্যাগ খুলে দেখল। ভেতরে একশ ডলারের কয়েকটি নোট ছিল। সে সবকটি নোট বের করে পকেটে ঢোকাল। তারপর সে মানিব্যাগটা ফেলে দিল। আমার গাড়ির চাবিটা পেছনের পকেটে ঢোকাল।
ডা. ইভাঙ্গ প্রিন্সেসের লেজের ফুলে উঠা যে যায়গার কথা বলেছিলেন, সেটা ভাল করে দেখলাম। তার স্বাভাবিক দুই ইঞ্চি বেড়ের তুলনায় জায়গাটা দুইগুন মোটা।
“কি করতে হবে তাই বলি,” সর্পমানব বলল। “তুই প্রিন্সেসের চিকিৎসা করবি, তাহলে আমি কারো কোন ক্ষতি করব না।”
“অবশ্যই,” ডা. ইভাঙ্গ বললেন। “আপনি যা চাবেন তাই হবে। আমরা তার

চিকিৎসা করব।”
সে ক্যানডেসকে উদ্দেশ্য করে বলল, “পিছন থেকে বেরিয়ে সামনে আয়।”
সে আসতে শুরু করল।
“তোরা দুইজন, পিছা।”
ডা. ইভাঙ্গ আর আমি ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেলাম। ক্যানডেস ডেস্কের পেছন থেকে বেরিয়ে এল।
প্রথমবারের মত আমার ল্যাসির কথা মনে হল। ওকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।
“ঠিক আছে, দাঁড়া।”
সর্পমানব ক্যানডেস থেকে এক ফুট দূরে। সে বাম হাত সামনে বাড়িয়ে তাকে হলওয়ে ধরে আমাদের দিকে আসতে ইঙ্গিত দিল। তার বন্দুক ডা. ইভাঙ্গ আর আমার দিকে তাক করা।
ক্যানডেস কি করতে যাচ্ছে আমি তার চোখ দেখে বুঝতে পারলাম।
আমি তার দিকে চিৎকার করতে চাইলাম, “নাআআআ।”
সে সামনে এগিয়ে সর্পমানবের বাড়ানো হাত থেকে সাপটাকে কেড়ে নিয়ে ডেস্কের পেছনে ছুড়ে মারল। সর্পমানব সাপের দিকে এগিয়ে যেতেই ক্যানডেস গেটের দিকে দৌড় দিল।
আমি সর্পমানবকে দেখতে না পেলেও ক্যানডেসকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কাঁচের তৈরি গেট থেকে দশ ফুট দূরে। পাঁচ ফুট। দুই ফুট।
বন্দুকের গুলির কর্কশ শব্দে ঘর ভরে গেল।
ক্যানডেস সামনের দিকে হোঁচট খেয়ে দরজার গায়ে বাড়ি খেল, তারপর মেঝেতে পড়ে গেল।
ডা. ইভাঙ্গ ওদিকে দৌড় দিলেন, কিন্তু পৌঁছানোর আগেই সর্পমানব বাঁধা দিল।
“পিছিয়ে যাও।”
আমার মনে হয় না সে ডা. ইভাঙ্গকে গুলি করবে, ওকে তার দরকার। কিন্তু শুধু শুধু ঝুঁকি নেয়ার কি দরকার।
রিসেপশনের দিকে বন্দুক দেখিয়ে সর্পমানব ডা. ইভাঙ্গকে নির্দেশ দিল, “প্রিন্সেসকে খুঁজে আন।”

ডা. ইভান্স মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশ পালন করল।
সর্পমানব পিছনের দিকে হেটে ক্যানডেসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার পিঠে বাম কিডনির কাছে গুলি লেগেছে। তার নীল পোশাক লাল হয়ে যাচ্ছে।
সে দুইদিকে তার মাথা ঝাঁকাল। সে হাত দিয়ে চোখ মুছে বিড়বিড় করে কি বলল শুনতে পেলাম না।
"তুই," সে আমার উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠল। "ওকে তোল।"
আমি সামনে হেটে গিয়ে হাটু গেড়ে বসলাম।
"আমার মনে হয় না ওকে নড়ানো ঠিক হবে," আমি তাকে বললাম।
"তোল বলছি।"
আমি তাকে তুললাম।
সে ককিয়ে উঠল।
সে মারডক থেকে চল্লিশ পাউন্ড হালকা, কিন্তু উত্তেজনার কারনে আমার মনে হল সে যেন একশ পাউন্ড হালকা।
সর্পমানব ডা. ইভান্সের দিকে এগিয়ে গেল। তিনি প্রিন্সেসকে দুইহাতে সাবধানে ধরে রেখেছেন। তারা দুজন কি কথা বলল শুনতে পেলাম না।
"আপনার কিছুই হবে না," আমি ক্যানডেসকে বললাম।
সে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে।
"আমি দুঃখিত," সে বিড়বিড় করে বলল।
সে দুঃখিত কেন বলল- গুলি খাওয়ার জন্য নাকি সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেছিল বলে বুঝতে পারলাম না।
"আমি হলেও একই কাজ করতাম," আমি তাকে বললাম, যদিও আমার এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় সে ভাবছে যে, সে ভীতুর মত আচরণ করেছে। আসলে সে প্রচুর সাহসিকতা দেখিয়েছে। আমি যা করতে পারতাম তার থেকে এটা অনেক বেশি সাহসের কাজ।
"আমার পেছন পেছন আয়," সর্পমানব নির্দেশ দিল।
আমি ক্যানডেসকে নিয়ে সামনে এগোলাম। হাসপাতালের পেছনের দরজা দিয়ে বের হলাম। সেখানে নানা আকার আর আকৃতির খাঁচা দেখতে পেলাম। সবগুলোই খালি।

একটা খাঁচা অনেক বড়, এক তলা থেকেও বেশি উঁচু। মোটা শিকের দরজা। আঙটায় চাবিসহ একটা তালা ঝুলছে।
সর্পমানব আমাকে ভেতরে যেতে নির্দেশ দিল।
আমি ভেতরে ঢুকলাম।
আমি আস্তে করে ক্যানডেসকে নামিয়ে রাখলাম।
“তোর সেই বলদ কুত্তাটা কই?”
“এক্সরে রুমে,” ডা. ইভান্স তাকে বললেন।
“ও কিছু করবে না,” আমি বললাম। “সে নড়তেও পারছে না।”
“ফালতু কথা, সে যেভাবে প্রিন্সেসের দিকে তাকাচ্ছিল আমার পছন্দ হয় নি।”
আমি আর ডা. ইভান্স এক্সরে রুমে গিয়ে মারডককে তুলে নিলাম। সর্পমানব সারা পথ আমাদের দিকে বন্দুক ধরে রাখল। ডা. ইভান্স ফিসফিস করে বললেন, “ক্যানডেসের আঘাতে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে। আপনার শার্ট খুলে চাপ দিয়ে–”
“একদম চোওপ।”
আমরা চুপ করলাম।
আমরা মারডককে তুললাম। আমি ডা. ইভান্সকে দ্রুত হ্যা বোধক ইঙ্গিত করলাম।
দশ সেকেন্ড পর, মারডক, ক্যানডেস, আর আমি নয় ফুট বাই ছয় ফুট “খাঁচা”য় বন্দী হলাম।
আমি জামা খুলে বলের মত বানালাম। তারপর ক্যানডেসের উপর যত জোরে পারি চেপে ধরে রাখলাম।
সে গুঙিয়ে উঠল।
মারডকও উচ্চ স্বরে গুঙিয়ে উঠল।
আমি প্রার্থনা করতে থাকলাম।

চার

“ল্যাসি... ল্যাসি... ল্যাসিইইই।”

আমি খাচার গরাদের সাথে আমার মুখ লাগিয়ে ঘরের যতদূর চোখ যায় ল্যাসিকে খুঁজলাম। আর কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে হামাগুড়ি দিয়ে ক্যানডেসের কাছে ফিরে আসলাম। সে এখন খাঁচার পেছন দিকে রয়েছে। আমি আবার তার ক্ষতস্থানে চাপ দিয়ে ধরে রাখলাম।

তার রক্তে আমার জামার অর্ধেক ভিজে গেছে।

ক্যানডেস কেশে উঠল, তারপর বলল, “আ-আমার মনে হয় না আ-আপনি পে-পে-প্রেসিডেন্টের সাথে মিটিঙে উ-উপস্থিত হতে পা-পারবেন।”

আমি সামান্য একটু না হেসে পারলাম না।

আমি ভাবলাম তাকে বলি এটা মিথ্যা কথা। অথবা, পরের দশ মিনিট আমার অবস্থা সম্পর্কে বলি। আর কিছু না হলেও এটা তাকে ব্যথা ভুলে থাকতে সাহায্য করবে।

“হ্যা, মনে হচ্ছে আবার শিডিউল নিতে হবে।”

তার ছোট শরীর হাসির দমকে কেঁপে উঠল।

“না,” আমি বললাম।

“আমাকে হা-হাসাবেন না।”

“ঠিক আছে। প্রমিজ।”

সে আবার কেঁপে উঠল, তারপর ব্যথায় গোঙাতে শুরু করল।

আমার মনে হল আর কথা না বলাই ভাল হবে।

আমি হালকা একটু আওয়াজ শুনে খাঁচার বাইরে তাকালাম। ল্যাসি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে মাথা নিচু করে গভীর মনোযোগের সাথে তার একটা পা চেটে চেটে পরিষ্কার করছে।

চকাম... চকাম... চকাম... চকাম... চকাম... চকাম... চকাম...

মারডক ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

চকাম... চকাম... চকাম... চকাম... চকাম...

“এই, ল্যাসি।” আমি চেঁচালাম।

সে আমার দিকে তাকাল।

“দোস্ত, যদি তুই খেয়াল না করে থাকিস আমরা একটু বিপদে পড়েছি।”
মিয়াও।
“আমরা এখানে কি করছি? আমরা এখানে বন্দী, গাধা।”
মিয়াও।
“ঠিক আছে, আমি আমার কথা ফেরত নিচ্ছি, তুই গাধা না। যাচ্ছিস কই?”
মিয়াও।
“বিলি আর রামানুজানের সাথে লুকিয়ে থাকতে? বিলি আর রামানুজান কে?”
মিয়াও।
“গারবল?” আমি মাথা নাড়লাম। এখন এগুলো শোনার সময় নেই। “শোন, তুই যখন র‍্যাকুনের কাছে মার খেয়ে আসলি তখন তারা তোর পেট কি দিয়ে বেধে দিয়েছিল মনে আছে।”
মিয়াও।
“ওরা তাকে কি বলে ডাকে আমি কেয়ার করি না।”
মিয়াও।
“বেশ, মেহুইদার যখন তোকে পিটিয়ে ভর্তা বানিয়েছিল। এবার খুশি? এখন একটু যেয়ে দেখ যে জিনিস দিয়ে তোকে পেঁচিয়েছিল সেগুলো পাস কি না। এগুলো রোল করা থাকে।”
সে মাথা ঝাঁকিয়ে দৌড়ে চলে গেল।
আমি মারডকের দিকে ফিরলাম।
“সে বেশি কথা বলে।”

...

তিন মিনিট পার হওয়ার আগেই আমি টাইলসের মেঝেতে কিছু টেনে আনার আওয়াজ পেলাম। আমি কুঠুরীর কোনায় এসে বারের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম। ল্যাসি পিছন ফিরে হাঁটছে। সে একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ টেনে নিয়ে আসছে।
দশ সেকেন্ডেই সে খাঁচার কাছে পৌছে গেল।

আমি গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বের করে দিলাম। আমি শুধুমাত্র কনুই পর্যন্ত বের করতে পারলাম। ব্যাগ ফাঁক করে দেখলাম ব্যাগের ভিতরে কি আছে। তিনটা ছোট সাদা তোয়ালে, দুই রোল কাপড়ের ব্যান্ডেজ, এক রোল টেপ, দুই প্যাকেট সেলোক্স, একটি সিরিঞ্জ, এক টিউব লিডোসাইন আর কিছু কুকুরের খাবার।

"এতকিছু কি দেখে শিখলি?"

মিয়াও।

"হিট? সেটা কি, কোন মুভি?"

মিয়াও।

"ভল কিলমার?"

মিয়াও।

"সে মোটা হওয়ার আগে?" আমি থামলাম। "ঠিক আছে, এতকিছু দিয়ে আমি কি করব??"

মিয়াও।

"বুঝেছি।"

মিয়াও।

"হ্যা, পরিকল্পনাটা ভাল। আর এক কাজ কর, কয়টা বাজে জানার চেষ্টা কর।"

ল্যাসি সর্পমানব আর সাদা কোটের উপর নজর রাখতে আর সে কোন বেরনোর পথ বের করতে পারে কি না তা দেখতে চলে যায়।

ল্যাসি যেসব জিনিস নিয়ে এসেছে, আমি একে একে সেগুলো গরাদের ভিতরে ঢুকাই।

এরপর আমি ক্যানডেসের বুকের উপর থেকে শার্ট সরিয়ে ফেলি। আমি দুটো তোয়ালে দিয়ে যতটুকু পারি রক্ত মুছে ফেলি। তারপর লিডোসাইন দিয়ে সিরিঞ্জ ভর্তি করি

আমি জানি কিভাবে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়। আমি বললাম, "একটু চিমটি কাটার মত ব্যাথা পাবেন।"

আমি তিন জায়গায় লোকাল চেতনানাশক প্রবেশ করালাম তারপর আবার সিরিঞ্জ ভর্তি করলাম।

“ভ-ভ-ভাল লাগছে,” ক্যানডেস বিড়বিড় করে বলল।
“বেশ, তারপরও কিছুটা ব্যাথা পাবেন।”
আমি এক প্যাকেট সেলক্স খুললাম, যেটা ল্যাসির কথামত রক্তরোধী পাওডার। আমি পুরো প্যাকেট ক্ষতস্থানের উপর ঢেলে দিলাম।
ক্যানডেস ককিয়ে উঠল।
“দুঃখিত।”
আমি একটা তোয়ালে দিয়ে ত্রিশ সেকেন্ড চাপ দিয়ে ধরে রাখলাম। তারপর তোয়ালে একটু তুলে দেখলাম। রক্ত পড়ার হার অনেক কমে গেছে। দ্বিতীয় প্যাকেট দিয়েও একই কাজ করলাম।
আমি ক্ষতস্থানের উপর মোটা গজ কাপড় রেখে টেপ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলাম। তারপর আরো কিছুটা টেপ দিয়ে এমনভাবে বাঁধলাম যেন ক্ষতস্থানে সর্বোচ্চ চাপ পড়ে।
হয়ে গেলে, নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দিলাম।
আমি মারডকের দিকে ফিরে বললাম, “খারাপ হয় নি, কি বলিস?”
মারডকের এদিকে খেয়াল দেয়ার মত অবস্থা নেই। তার মুখ সবুজ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন গত এক ঘণ্টা ধরে সে ভেজা ঘাসের মধ্যে তার মুখ ঘষেছে। তার দুই চক্ষু জ্বলজ্বল করছে।
সে দাঁড়িয়ে পড়ল।
“মারডক!!”
তার পিঠ কুজো হয়ে গেল। শিরদাঁড়া শক্ত।
“মারডক, এখানে না!”
তার মুখ থেকে ঘড়ঘড় শব্দ বের হচ্ছে।
“ওহ্, শিট।”
আমি ছোট খাঁচার পিছন দিকে চলে এসে হাত দিয়ে চোখ ঢাকলাম।
আমি ছ্যাড়ছ্যাড় করে মাটিতে বমি পড়ার শব্দ শুনলাম।
ওয়াক।
দ্বিতীয় বার।

ওয়ায়ায়াককক।
তৃতীয়বার।
তারপর সব চুপচাপ।
আমি চোখের উপর থেকে হাত সরালাম।
খাঁচার অর্ধেক কমলা রঙের অর্ধতরলে মাখামাখি। অর্ধডুবন্ত রণতরীর মত টিস্যু পেপার এই তরলের উপর ভেসে রয়েছে।
আমার চোদ্দতম জন্মদিনের কথা। বাবা বলেছিল, সে আমাকে একটা স্পেশাল উপহার দিবে। আমরা গাড়িতে করে বাসা থেকে মাইল পাঁচেক দূরের একটা বড় শপিং মলে গিয়েছিলাম। আমি এর আগে কখনো মলে যাইনি। আমি ভাবছিলাম বাবা আমাকে কি দিবে। একজোড়া নাইকির নতুন জুতার কথা একবার শুনেছিলাম। আমি আশা করলাম আমরা জুতার দোকানের দিকে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা জুতার দোকানের দিকে গেলাম না। এর পরিবর্তে আমরা একটা দোকানের সামনে থামলাম। সারা মলের মধ্যে এটিই একমাত্র দোকান, যার গেট নামানো ছিল না। আমি কিছুই বুঝলাম না।
“অরেঞ্জ জুলিয়াস কি জিনিস?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।
দশ মিনিট পরেই আমি আমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম।
অরেঞ্জ জুলিয়াস যেন স্বর্গ।
বাসায় এসে দেখি দুই বাক্স নাইকির নতুন জুতা আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।
সেদিন আমি আর বাবা কোয়াইট ফাউন্টেইনের সামনে একটা বেঞ্চে বসে কমলার জুস খেয়েছিলাম। এতদিন পরও মনে হল আমার জিভে তার স্বাদ পেলাম। যদি অরেঞ্জ জুলিয়াসের সেই কমলার রস আমার চোদ্দতম জন্মদিন থেকে আজ পর্যন্ত সূর্যের নিচে থাকত, তাহলে যে রকম গন্ধ হতো, আমার সামনে মারডক যে পুকুরের সৃষ্টি করেছে তার থেকে এমন গন্ধই বের হচ্ছে।
আমার দমবন্ধ লাগতে লাগল। পেটের মধ্যে যেন পাক খেয়ে উঠল।
বহুকষ্টে আমি পেটের মধ্য থেকে উঠে আসা বমি ঠেকাতে সক্ষম হলাম।
মারডক একদম আমার সামনে বসা। সে হাসছে। তার জিহবা মুখ থেকে বাইরে ঝুলছে। আমি তাকে কখনোই এত খুশি দেখি নি।

সে তার এক বিশাল পা তুলে আমার পকেট আঁচড়াতে লাগল।
আমি হেসে উঠলাম।
ল্যাসির নিয়ে আসা কুকুরের খাবার।
আমি হাড়ের মত ধূসর রঙের বিস্কুটটা বের করে তাকে খেতে দিলাম।
“আমার মনে হয় তোর এখন ভাল লাগছে।”
আমার হাতে লেগে থাকা গুড়াটুকুও সে চেটে খেল।
“আমরা এখান থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও পারলি না?”
সে শশব্দে বায়ুত্যাগ করল।
প্রশ্নের সাথে সাথেই জবাব।
আমি আবার জলের পিন্ডটির দিকে তাকালাম। ওটা এখন খাঁচার পিছন দিকে গড়িয়ে আসা শুরু করেছে। দেখে মনে হয় যেন গলন্ত লাভা ধীরে ধীরে পর্বতকে গ্রাস করে নিচে নেমে আসছে। আমি রক্তমাখা তোয়ালে দুটি আর আমার শার্ট দিয়ে বাঁধ তৈরী করলাম। তখনই আমার চোখ চলে গেল খাঁচার একদম ঐ প্রান্তে, একদম দরজাটার পাশে। একটা চারকোনা ধাতুর বস্তু চকচক করছে।
দ্বিতীয়বার কোন চিন্তা না করেই আমি ড্যাম পার হয়ে কমলা সিরাপের মত তরলের মধ্যে আমার হাত ঢুকিয়ে দিলাম। এটা নির্ঘাত আমার অনেক দূঃস্বপ্নেও হানা দেবে। আমি আমার মোবাইলটা বের করে আনলাম।
প্যান্টে ভাল করে মুছে আমি মোবাইলের স্ক্রীনের দিকে তাকালাম।
৩:৩৪ এ.এম.
“অসম্ভব,” আমি চিৎকার করে উঠলাম।
“ক্কি-কি হয়েছে?” ক্যানডেস আমার পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল।
“আমার মোবাইল এখনো কাজ করছে।”
আমি আবারও এটা প্যান্টে ঘষলাম, তারপর ফোন আইকনে ক্লিক করলাম।
এটাই হতে যাচ্ছে আসল পরীক্ষা।
স্ক্রীনে কন্ট্রাক্ট নাম্বারগুলো দেখা গেল।
আমার মুখে হাসি ফুটে উঠল।
আমি ইনগ্রিডকে ফোন করলাম।

দুইবার রিং হতেই সে ফোন ধরল।
“হ্যালো বেইবি,” সে অস্পষ্ট স্বরে বলল, “কি খবর?”
যদি আমার অবস্থা ভিন্ন হত তাহলে সে আমাকে প্রথমবার ‘বেইবি’ বলে ডেকেছে এটা নিয়ে খুশি হতাম। কিন্তু হাই! আমি সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলাম। “২ নাম্বার কর্নার এণ্ড স্প্রাউসের জরুরী পশু হাসপাতালে একটা মেয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে।”
আমি শুনতে পেলাম সে বিছানায় উঠে বসল।
“দাঁড়াও, আস্তে। তুমি এখন কোথায়?”
“আমি একটা খাঁচার মধ্যে। মারডক এইমাত্র বমি করে মোবাইলটা বের করে দিয়েছে।”
“কি?”
আমি পরের কয়েকটি মূহুর্ত ব্যয় করে তাকে বোঝালাম আমি কেন হাসপাতালে এসেছি, সর্পমানব, প্রিন্সেস, ক্যানডেস, খাঁচায় বন্দী হওয়া, আর তারপরের স্যামসাঙের মিরাকল।
আমি তাকে আরেকটি মোবাইলে কথা বলতে শুনলাম। অথবা রেডিওও হতে পারে। সে স্টেশনে ফোন করল। এক মিনিট পর সে আবার আমার লাইনে ফিরে এল।
“মেয়েটা কেমন আছে?”
“আমি তাকে লিডোসিন দিয়েছি। দিয়ে তার গুলির ক্ষতস্থান দুই প্যাকেট সেলোক্স, ব্যান্ডেজ আর টেপ দিয়ে বেধে দিয়েছি। এখন অবস্থা স্টেবল, কিন্তু প্রচুর রক্ত হারিয়েছে।”
“লিডোসিন? সেলোক্স? তুমি কি সার্জন নাকি?”
“খন্ডকালীন।”
সে হেসে উঠল। “হ্যা।”
“ঠিক আছে, সাবধানে থেকো। আর ফোন খোলা রেখ।”
আমি ফোন রেখে দিলাম।
এখন সময় ৩:৩৮ এ.এম.
দুই মিনিট পর প্রথম সাইরেনের শব্দ কানে মধুবর্ষন করল।

পাঁচ

"আমরা তোমাকে ঘিরে ধরেছি। হাত তুলে বাইরে বেরিয়ে এসো।"

এটা যেন একদম সিনেমার মত। অথবা এটা একদম আমার দেখা সিনেমার মত। সিনেমার নামটা আমার মনে নেই, কিন্তু আমার দেখা বাকি সব সিনেমার মত এটাও বাবার পরামর্শে দেখা। আমি এখন পর্যন্ত ঊনত্রিশটি সিনেমা দেখেছি। আমার এটুকু মনে আছে যে সিনেমাটিতে স্যামুয়েল এল. জ্যাকসন ছিল।

এমনকি হাসপাতালের পিছনে একটা ছোট খাঁচায় আটকে থেকেও বুঝতে পারলাম ইউনিফর্ম পরা লোকটি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জড়ানো গলায় মেগাফোনে কি বলছে। আমি দেখতে পেলাম হাসপাতালের পার্কিং লটে পাঁচটি পুলিশের গাড়ি এলোমেলোভাবে পার্ক করা রয়েছে। গাড়িগুলোর দরজা খোলা। গাড়ির আরোহীরা লাল ইটের দালানের কাচের দরজার দিকে বন্দুক বাগিয়ে ধরে আছে।

এক ঝটকা দিয়ে হাস্পাতালের পিছনের দরজা খুলে গেল। ডা. ইভান্স হোচট খেয়ে এসে পড়লেন। পিছন পিছন এলো সর্পমানব আর তার বন্দুক।

"তুই কি করেছিস হারামজাদা?" সর্পমানব আমাকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল।

তার চক্ষুদ্বয় যেন জ্বলছে, নাক থেকে যেন আগুনের হলকা বের হচ্ছে। হয় সে ভয় পেয়ে কান্ডজ্ঞান হারিয়েছে অথবা সে কোনভাবে আবার নেশা করেছে।

"তুই কি করেছিস হারামজাদা," সে আবার বলল। সে ডা. ইভান্সকে ধাক্কা মেরে খাঁচার উপর ফেলে দিয়ে আমার দিকে বন্দুক তাক করল।

আমি হাত দুলে দাঁড়ালাম। "কিছুই করিনি। আপনি আমাদের যেখানে আটকে রেখে গিয়েছিলেন আমরা সেখানেই আছি।" আমি নাটকীয়ভাবে খাঁচার চারদিকে তাকালাম। তখনই খেয়াল করলাম, ক্যানডেসের কাছে দুই প্যাকেট সেলোক্সের প্যাকেট পড়ে আছে। আমি তার ব্যান্ডেজের উপর তার জামা পুনরায় টেনে দেয়ার কাজ বুদ্ধিমানের মতই করেছি। কিন্তু বোকার মত এই দুইটা প্যাকেটের কথা আমার মনেই ছিল না। আমি ক্যানডেসের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে এই প্যাকেট আড়াল করার চেষ্টা করলাম।

"কেউ নিশ্চয়ই গুলির শব্দ শুনেছে," ডা. ইভান্স নীচু স্বরে বললেন।

"শিট, শিট, শিট," সর্পমানব চেঁচাতে লাগল। আর প্রতিবার বলার সাথে সাথে

বন্দুক দিয়ে গরাদের উপর বাড়ি মারতে লাগল।
ডা. ইভাঙ্গ কমলা রঙের বমির পুকুরের দিকে তাকালেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “মনে হচ্ছে মারডক নিজের ব্যবস্থা নিজেই করেছে।”
আমি মাথা ঝাঁকালাম।
আমি আশা করলাম তিনি এ মাথা ঝাকানো থেকে তিনটি জিনিস বুঝতে পারবেন। ১) আমার কাছে মোবাইল ফোন আছে। ২) অবিশ্বাস্যভাবে এটা কাজ করছে। এবং ৩) পুলিশকে আমিই ফোন করেছি।
ভাগ্য ভাল, সর্পমানব কিছুই বুঝতে পারল না।
“শুনেন,” আমি সর্পমানবকে বললাম, “মেয়েটি অনেক রক্ত হারিয়েছে। তাকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার। যদি সে মারা যায়, আপনি এখনকার চেয়ে আরো অনেক বেশি ঝামেলায় পড়বেন।”
সে মেয়েটির দিকে তাকালো, মনে হলো আমার কথা ভেবে দেখছে। তারপর ডা. ইভাঙ্গের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, “প্রিন্সেসকে ঠিক করতে আর কত সময় লাগবে?”
“মাত্র সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। সার্জারী করতে আরো পয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগবে।”
আমি ক্যানডেসের অবস্থা দেখলাম। চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আরো পয়তাল্লিশ মিনিট সে বাঁচবে বলে মনে হয় না।
সর্পমানব এতদূর চলে এসেছে। ক্যানডেস আর প্রিন্সেসের মধ্যে একজনকে বাছতে হলে সে প্রিন্সেসকেই বাছবে।
আর সে তাই করলো।
সে ডা. ইভাঙ্গকে একরকম খেদিয়েই ভেতরে নিয়ে গেল।
আমি পকেট থেকে মোবাইল বের করে সময় দেখলাম।
৩:৪৪ এ.এম.
আর ষোল মিনিট।
আমি যদি সামনের ষোল মিনিটে ক্যানডেসকে এখান থেকে মুক্ত করে পুলিশের কাছে না নিয়ে যেতে পারি, তবে সে মারা যাবে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

ইনগ্রিড দুইটি ম্যাসেজ পাঠিয়েছে।
আমার পৌঁছতে আর ২ মিনিট লাগবে।
এবং।
আমি এসে গেছি।
আমি স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে থাকতেই আরেকটা ম্যাসেজ আসল।
তোমার সিট্রেপ কি?
প্রথমবার যখন ইনগ্রিড 'সিট্রেপ' শব্দটি ব্যবহার করেছিল, এর অর্থ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। পরিস্থিতি রিপোর্ট সে বুঝিয়েছিল।
"এখনো আটকা আছি," আমি উত্তর পাঠালাম। "লোকটি থতমত খেয়ে গেছে। সার্জারী চালিয়ে যাবে। ডা. বলেছে, ৪৫ মিনিট লাগবে। মেয়েটা বাঁচবে না।"
এক মুহুর্ত পরেই ইনগ্রিডের উত্তর এসে গেল। তোমার আর তের মিনিট বাকি আছে।
আমি জানি।
কিছু না ভেবেই আমি একটা দুঃখের ইমোজি যোগ করলাম।
তারপর আমি ম্যাসেজ লিখলাম, তাকে বল মেয়েটাকে ছেড়ে দিতে। সে দিতেও পারে। বিশ্বাস রেখে।
আধ মিনিট পর, আমি আবার হ্যান্ড মাইকে শব্দ শুনতে পেলাম। "আমরা জানি ভেতরে একজন আহত মহিলা আছেন। মেয়েটাকে ছেড়ে দাও তাহলে কারো ক্ষতি হবে না।"
ঠিক কথা। যদি পনের বছর হাজতবাসকে ক্ষতি বলা না হয়।
এক মুহুর্ত পরেই আমি দুইজোড়া পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।
সর্পমানব ডা. ইভান্সকে সামনের দরজা দিয়ে ঠেলে বের করে দিল। সর্পমানবের হাত ডা. ইভান্সের গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে। তার মাথার পাশে বন্দুক ঠেকানো।
"তোরা যদি ভুলেও ভেতরে আসার চিন্তা করিস আমি ডাক্তারকে মেরে ফেলব। আর এ ছাড়াও আরো তিনজন জিম্মি হিসেবে আছে। আমি সবাইকেই মেরে ফেলব।"
পদশব্দ পিছিয়ে মিলিয়ে গেল।

আবার সার্জারী শুরু হল।
একটা মেসেজ আসল।
ইনগ্রিড: সে তামাসা করছে না। কতজন জিম্মি আছে?
আমি: সে মিথ্যা বলেছে। শুধুমাত্র ডাক্তার আর আমি।
আমি: ঝড়ের বেগে অভিযান চালাও।
ইনগ্রিড: আমার সিদ্ধান্ত নয়। প্রধান এজেন্ট চাচ্ছে ওর বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করতে।
আমি: মেয়েটা মারা যাবে!!!
দুইটা দুঃখের ইমোজি।
সে জবাব দিল না।
আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম।
৩:৫০ এ.এম.
দশ মিনিট।
আমি মৃদু খসখস শব্দ শুনলাম।
আমি কমলা তরলের উপর দিয়ে গরাদের বাইরে তাকালাম।
ল্যাসি হেটে আসছে। সে কিন্তু একা নয়। তার সাথে আছে আরো দুইজন। দুইটা নাদুস নুদুস গারবিল।
বিলি আর রামানুজান।
তিনজন এসে আমাদের খাঁচার সামনে থামল।
মিয়াও।
“তোর বেস্ট ফ্রেন্ড বমি করেছে, তার গন্ধ।”
মিয়াও।
“হ্যা, বিশ্রী গন্ধ।”
মিয়াও।
আমি বিলি আর রামানুজানের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালাম। “তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশী হলাম।”
তারা তাদের গোঁফ নাড়ালো।

“তুই কি বেরনোর আর কোন পথ পেলি?”
মিয়াও।
“কিছুই না, সত্যি?”
মিয়াও।
“তোর কোন দোষ নেই।”
রামানুজান অথবা বিলি – কোনটা যে কে ঠিকমত বুঝতে পারছি না – গরাদের ফাঁক দিয়ে তার মোটা মুখ ঢুকিয়ে দিল। তারপর একটা বড় টিস্যু পেপার কামড়ে ধরল।
“না,” আমি মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম। “এটা খেও না।”
সে আমার কথা শুনল না।
আমি অবাক হয়ে দেখলাম সে ধীরে ধীরে ভেজা, ন্যাতানো, কমলা টিস্যু নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে। তারপর এগুলো মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। আস্তে আস্তে তার মুখ বড় হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন সে একটি ছোট আকারের আস্ত ফুটবল মুখে ঢুকিয়েছে। সে শেষ টিস্যু পেপার নিয়ে টান দিল।
আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।
ল্যাসির চোখ বড় বড় হয়ে গেল।
মারডক – যে চুপচাপ সপ্রশংস দৃষ্টিতে সব দেখছিল – ওর চোখ হল সবচেয়ে বড়।
ঝুনঝুনি বল।
এটা এতক্ষণ টিস্যু পেপারের নিচে চাপা পড়ে ছিল।
আমি দৌড়ে গিয়ে এটি তুলে নিলাম। মাত্র একমুহূর্তের জন্য মারডক এর নাগাল পেল না।
ল্যাসির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
মিয়াও।
“আমি তোকে বলটি দিচ্ছি না।”
মিয়াও।
“মুখ খারাপ করবি না। আর আমার মনে হয় না, তুই তোর অতটুকু থাবা দিয়ে আমার গলা কাটতে পারবি।”

আমি তাকে দশটি ঝুনঝুনি বল আর সামান্য ব্ল্যাক ক্যাভিয়ার খাওয়ানোর কথা দিয়ে শান্ত করলাম।
তারপর আমি তাকে আমার পরিকল্পনার কথা বললাম।
ত্রিশ সেকেন্ড পর, আমি আমার পকেট থেকে ঝুনঝুনি বলটি বের করে মারডককে দেখালাম। আমরা এখন খাঁচার একদম পেছন দিকে আছি, খাঁচার দরজা থেকে দশ ফুট দূরে। কিছুটা গতি তোলার জন্য তার জন্য যথেষ্ট জায়গা।
মারডক পিছন পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে গেল।
আমি ঝুনঝুনি বলটি ছুড়ে মারলাম আর এটি বারের ফাঁক দিয়ে ঝুনঝুন, ঝুনঝুন শব্দ করতে করতে হলওয়ে ধরে বাইরে চলে গেল।
“ওটা নিয়ে এসো, মারডক।”
আমি জানি না পদার্থবিজ্ঞানে এর আসল ব্যাখ্যা কি, কিন্তু আমি এটা জানি যে ১৬০ পাউন্ড ওজনের কোন বস্তু যখন ঘণ্টায় আট বা দশ মাইল করে যায়, এটা অনেক শক্তির সৃষ্টি করে।
খাঁচার তালা কিন্তু অক্ষত থাকল। প্রথম ধাক্কায়ই উপরের কব্জা ছুটে গেল। নিচের কব্জাও দ্রুতই হাল ছেড়ে দিল। মারডক তার পুরষ্কার আনতে দৌড়ে গরাদের ওপাশে চলে গেল।
আমি নিচু হয়ে ক্যানডেসকে তুলে নিলাম।
সে ককিয়ে উঠল না।
যদি তার বুক উঠানামা না করত, আমি হয়তো ভাবতাম সে মারা গেছে। আমি আস্তে করে গেট পার হয়ে দরজা খুলতেই জায়গায় জমে গেলাম।
সর্পমানব আমার মাথা বরাবর পিস্তল তাক করে আছে।
আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

সে মারডকের কলার ধরে রেখেছে। সে আমাকে সামনে যেতে ইশারা করল। হল দিয়ে যাওয়ার সময় কাচের দরজার অপর পাশে প্রায় ষাট ফুট দূরে নীল আর লাল আলোর নাচানাচি দেখতে পেলাম। সে দরজা খুলে আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে আসল। ডা. ইভাঙ্গ একটা স্কারপেল হাতে নিয়ে ছোট টেবিলের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রিন্সেস টেবিলের উপর শুয়ে আছে। তার শরীরে সাদা কাপড় জড়ানো।

ডা. ইভাঙ্গ মাথা তুলে আমাকে দেখলেন। আমার কোলে থাকা ক্যানডেসের দিকে চোখ পড়তেই তিনি ঢোক গিললেন।

“তাকে ওখানে মেঝেতে শুইয়ে রাখ,” সর্পমানব নির্দেশ দিল।

আমি হাটুতে ভর দিয়ে বসলাম, তারপর সর্বোচ্চ সাবধানতার সাথে তাকে দেয়ালের পাশে শুইয়ে দিলাম। “ভয় পাবেন না,” আমি ফিসফিস করে বললাম। “আমি আপনাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবই।”

সে খুবই মৃদুস্বরে কেশে উঠল।

আমি উঠে ঘুরে দাঁড়ালাম।

সর্পমানব মারডককে ঠেলে আমার পাশে নিয়ে এসে বলল, “যদি সে একটুও নড়ে, আমি তাকে গুলি করব।”

আমি মারডককে বললাম ক্যানডেসের পাশে শুয়ে থাকতে। সে তিনবার ক্যানডেসের মুখ চেটে দিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়ল।

“আমার বুঝতে কিছুটা সময় লেগেছে,” সর্পমানব মুচকি হেসে বলল, তার ছাগলের মত লাল দাঁড়ি হাসির সাথে সাথে আন্দোলিত হচ্ছে, “শুয়োরের বাচ্চা পুলিশরা এখানে এলো কিভাবে।”

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আমি চাই সে ভাবুক আমি সকল আশা ত্যাগ করছি।

তার চোখের ঝলক দেখে বুঝলাম সে বিশ্বাস করেছে।

“দাও,” সে খেঁকিয়ে উঠল।

আমি পকেট থেকে মোবাইল বের করলাম। সে আমার হাত থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নেয়ার সময় শেষবারের মত স্ক্রীনের দিকে তাকালাম

৩:৫৪ এ.এম.

তিন মিনিট।

“এটা খেয়ে ফেলার পরও কাজ করছে বিশ্বাসই হয় না,” সে মোবাইল দেখতে দেখতে বলল, “ইনগ্রিড কে?”

“আমার গার্লফ্রেন্ড। তাছাড়া সে আলেক্সান্ড্রিয়া গোয়েন্দা বিভাগের সদস্য।”

আমি মিথ্যাও বলতে পারতাম, কিন্তু সত্য বললেই আমার উদ্দেশ্য পূরণ বেশি সহজ হবে।

“আমি তাকে ফোন করেছিলাম,” আমি বললাম। “সে তার বন্ধুদের ফোন করেছে।”

“বোকার মত কাজ,” সে বলল, আসলেই যেন তাই।

আমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল বলে মনে হল। মনে হচ্ছে আমার জন্য বুলেট অপেক্ষা করছে। সুখবর হলো যে, এটা ঘটার সময় আমি ঘুমিয়ে থাকব।

সে ম্যাসেজগুলো চেক করছে। আমি অপহৃত হওয়ার পরের সকল ম্যাসেজ ডিলিট করে দিয়েছি। আমি চাইনি সে ওগুলো পড়ুক। বিশেষ করে শেষ ম্যাসেজটি।

আমি ডা. ইভান্সের দিকে তাকালাম। তিনি সার্জারী করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “সার্জারী কেমন হচ্ছে?”

তিনি আমাকে অগ্রাহ্য করলেন।

“সে ভাল আছে তাই না ডাক্তার?” সর্পমানব খুশী খুশী গলায় বলল।

সে অপারেশন টেবিলের মাথার দিকে গিয়ে প্রিন্সেসের মাথায় আঙুল বুলিয়ে দিল। “সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটু সময় লাগবে।”

প্রিন্সেস হালকাভাবে হিসিয়ে উঠল।

“তার কি জেগে থাকার কথা?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ডাক্তার অল্প একটু মাথা ঘুরিয়ে বললেন, “আমি তাকে চেতনানাশক দিয়েছিলাম, কিন্তু এটার প্রভাব শেষ হয়ে গেছে। সে যতক্ষণ শান্ত আছে ততক্ষণ আমাদের কোন ভয় নেই।”

ঠিক কথা।

কিন্তু সেটা হচ্ছে না।

আমি মনে মনে এক মিনিট বাদ দিলাম।

৩:৫৫ এ.এম।
দুই মিনিট।
“সার্জারী শেষ হলে আপনার পরিকল্পনা কি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম। “আপনি পালাবেন কিভাবে?”
সর্পমানবের ভ্রু কুঞ্চিত হল। আমার মনে হয় না সে এটা ভেবে দেখেছিল। অবশেষে সে শ্রাগ করে বলল, “যতক্ষণ তোমরা আমার জিম্মি হিসেবে আছ, তারা কিছুই করবে না।”
“আপনি জানেন, মেয়েটি এখনো বেঁচে আছে। আপনি এখনও অনেক সমস্যা থেকে বেঁচে যেতে পারেন। বেশি হলে এক-দুই বছরের জেল হবে।”
মনে হল সে আমার কথা ভেবে দেখছে।
“না।”
আমি যা ভেবেছিলাম। তার আরো বেশি সাজা হবে। সে আগেও আরো অনেক অপরাধ করেছে। খুনের চেষ্টার জন্য অন্তত কুঁড়ি বছরের সাজা তো তার হবেই।
সে সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করবে। তার হারানোর কিছুই নেই।
আমি মনে মনে আরও এক মিনিট বাদ দিলাম।
৩:৫৬ এ.এম।
আর এক মিনিট।
আমি আধ পা সামনে বাড়লাম যেন আমি তার ছয় সাত ফুটের মধ্যে থাকতে পারি। সে প্রিন্সেসের মাথায় হাত বুলিয়েই যাচ্ছে। তার ডান হাত পয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে আছে, পিস্তলের নল আমার পায়ের দিকে ধরা। আমি যদি তার দিকে এগিয়েও যাই, অর্ধেক পথ পৌছানোর আগেই সে পিস্তল তুলে গুলি করে আমার বুক ঝাঁজরা করে দেবে।
আমি মনে মনে শেষ দশ সেকেন্ড গুনতে শুরু করলাম।
দশ।
নয়।
আট।
সাত।

ছয়।
পাঁচ।
চার।
ফোন বেজে উঠল।
হয় ইনগ্রিড চার সেকেন্ড আগেই ফোন করেছে অথবা আমার গোনার ভুল হয়েছে। পরেরটাই হওয়ার কথা।
বন্দুকের গুলির শব্দে ঘর ভরে গেল। ইনগ্রিড তামাশা করে তার রিংটোন হিসেবে বন্দুকের লাগাতার শব্দ সেট করে রেখেছিল আর আমি মোবাইলের রিংটোনের সাউন্ড সর্বোচ্চ করে রেখেছিলাম।
ডা. ইভান্স আর সর্পমানব দুজনই লাফিয়ে উঠল। যখনই বুঝতে পারল যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা 'শুয়োরের বাচ্চারা' গুলি করেনি বরং সর্পমানবের পকেটের মোবাইল থেকে আওয়াজ এসেছে দুজনই সামলে নিল।
সে মোবাইল বের করে স্ক্রীনের দিকে দেখল।
"তোর গার্লফ্রেন্ড," সে বিকৃত কাষ্ঠহাসি হেসে বলল।
আমি চাচ্ছিলাম সে এটার উত্তর দিক, কিন্তু এখনই নয়, আরো দশ বা পনেরো সেকেন্ড পরও নয়।
"আপনি কি জিনিস চান মুক্তিপন হিসেবে ভেবে দেখেছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
সে দুইদিকে মাথা ঝাঁকাল।
সে ভেবে দেখে নি।
"পালানোর গাড়ি, হেলিকপ্টার, টাকা।" আমি সাজেশন দিলাম।
বন্দুকের গুলির শব্দে ঘর ভরে যাচ্ছে। সে এখনো মোবাইলের দিকে তাকিয়ে আছে।
কুঁড়ি সেকেন্ড পর ভয়েজমেইল চালু হয়ে যাবে।
আমার হিসেবে এখন পর্যন্ত বারো সেকেন্ড হয়েছে।
তের।
চৌদ্দ।
পনের।

ষোল।
সতের।
আঠারো।
“জবাব দাও,” আমি তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করলাম। “তোমার জবাব দেয়া উচিত।”
সে ফোন ধরে কানে ঠেকালো। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল “কে?”
ইনগ্রিড কি বলল তা আমি শুনতে পেলাম না। আমার শোনার দরকারও নেই। আমি তাকে শেষ ম্যাসেজে লিখেছিলাম, “ঠিক ৩:৫৭ তে ফোন করবে। কিডন্যাপার ফোন ধরবে। তাকে ব্যস্ত রেখো। আর ম্যাসেজ পাঠিও না।”
এখন পর্যন্ত সব ঠিকমত চলছে।
মাথা না নাড়িয়েই উপরের ছাদের দিকে নজর দিলাম।
আমি চারকোনা সাদা প্যানেলের মধ্যে কালো রঙ খুঁজছি। খুঁজে পেতে দশ সেকেন্ড সময় লাগল। ডা. ইভান্সের বাম পাশে ট্রে টেবিলের ঠিক উপরে।
সম্ভবত আধ ইঞ্চি কালো।
একটা গর্ত।
বিলি আর রামানুজানের বদান্যতা। আর এটাও মাত্র আঠারো সেকেন্ডে।
আমি ছাদে দুটি গারবেলকে দেখতে পেলাম। তাদের মুখ সিলিং যে চকের মত জিনিস দিয়ে তৈরি, তাতে ভর্তি।
ল্যাসি যখন প্রথমবার বলে যে, সে দুইজন গারবিলের সাথে লুকিয়ে ছিল, আমি ভেবেছিলাম সে কোন খাঁচাতেই লুকিয়ে ছিল। আমি ভেবেছিলাম গারবিল দুটো অসুস্থ আর তাই রাতের জন্য হাসপাতালে থাকতে হচ্ছে।
আমি ভুল ভেবেছিলাম।
ল্যাসির কথা অনুসারে, সে যখন দৌড়ে পালিয়ে যায়, হলওয়ে ধরে ছুটে গিয়ে সে একটি ক্লজেটে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সে যখন গুলির শব্দ শুনতে পায়, সে একটা খোলা ঘুলঘুলির মধ্যে ঢুকে সিলিঙের মধ্যে সেধিয়ে যায়। সেখানেই তার সাথে বিলি আর রামানুজানের পরিচয় ঘটে। খাচা থেকে পালিয়ে গিয়ে গত আট মাস ধরে দুই ভাই ওখানেই লুকিয়ে আছে।
“একটি হেলিকপ্টার,” সর্পমানব চিৎকার করে বলল, “আর এক লাখ ডলার।”

সাবাস।

আমি মারডকের পাশে হাটু গেড়ে বসলাম। তাকে সামান্য একটু গড়িয়ে কাত করলাম যেন তার পেট দেখা যায়। এক ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বারের মত সে ঝুনঝুনি বলটা গলাধকরণ করেছে। এটা তার পেটের মধ্যে কোথাও আছে। আমি দুই হাত দিয়ে তার পেট ধরে ঝাঁকি দিলাম। এটা যেন বিশ্বের সবথেকে বড় মারাকা বাদ্যযন্ত্র। সর্পমানবের শোনার মত অত জোরে শব্দ হলো না, তাছাড়া সে এখন তার "কূটনৈতিক মুক্তি" নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত– তাছাড়া আমি মনে করি না এটা কিভাবে কাজ করল সেটা সে বুঝতে পারত – কিন্তু ল্যাসির কাছে, যার জীবনে এই শব্দই সবকিছু, এটা বজ্রের গর্জনের মত শোনাবে।

এক মুহুর্তের জন্য আমার মনে হল সে সঙ্কেত শুনতে পায় নি। তখন আমি গর্তের মুখে গোঁফের দেখা পেলাম, তারপরই একটা নাদুস নুদুস মুখ দেখা দিল।

বিলি – অন্তত আমার মনে হল এটা বিলি, ওদের একজনের মাথার পেছনের দিকে একটু সাদা ডোরাকাটা দাগ আছে – সার্জিক্যাল টেবিলের উপর লাফিয়ে পড়ল। সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ছিটকে পড়ার ঠং-ঠাং আওয়াজ শুনতে পেলাম।

ডা. ইভান্স লাফিয়ে তিন ফুট পিছিয়ে এলেন।

সর্পমানব ঘুরে তাকাল, মনে হচ্ছে তার চোখ যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। সে চেঁচিয়ে বলল, "হচ্ছে কি শুও–"

আবার থপ করে শব্দ হলো। এবার রামানুজান লাফিয়ে পড়ে বিলির সাথে যোগ দিয়েছে।

দুইটা গারবিলই ট্রে টেবিল থেকে লাফ মেরে অপারেশন টেবিলে আসল।

"ইঁদুর," সর্পমানব গলা ফাটাল।

সম্ভবত ইঁদুর বলাতে অপমানিত হয়ে, অথবা আমাদের মুক্তি পেতে সাহায্য করার জন্য, রামানুজান এক ছুটে অপারেশন টেবিল পার হয়ে লাফিয়ে সর্পমানবের মুখের উপর পড়ল।

সর্পমানব চেঁচিয়ে এলোমেলোভাবে ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

সে বামহাত দিয়ে মুখ খামচাচ্ছে, বন্দুক ধরা ডান হাত এলোমেলোভাবে ঘুরছে।

দুইবার বন্দুক গর্জে উঠল।

আমি লাফিয়ে মাটিতে পড়লাম।
আবার গুলি।
আমি জোর উফফ শব্দ শুনতে পেলাম।
ডা. ইভান্স।
তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন।
আমি জোর হিসস শব্দ শুনতে পেয়ে উপরে তাকালাম।
প্রিন্সেস।
সে অপারেশন টেবিলের একপাশে চলে এসেছে। চেতনানাশকের আর কোন কার্যকারিতা আছে বলে মনে হল না। বিলি টেবিলের একদম উলটো প্রান্তে ছোটাছুটি করছে। ডা. ইভান্স বুক চেপে ধরে মেঝেতে পড়ে আছেন। প্রিন্সেস বিলিকে ধরার জন্য ছোবল মারল। তার শরীর বর্শার মত বাতাস কেটে গেল। সামান্য আধ ইঞ্চির জন্য সে বিলিকে ধরতে পারল না।
আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।
টেবিল প্রিন্সেসের রক্তে ভর্তি। সে ঘুম থেকে উঠেই দুরন্ত গারবিলটাকে তাড়া করতে গিয়ে রক্তের দাগ রেখে যাচ্ছে। বিলি ঝটপট টেবিল পার হয়ে সর্পমানবের শার্টে লাফিয়ে পড়ল। তারপর জামা বেয়ে তার ঘাড়ে উঠে কামড়ানো আরম্ভ করল।
“সাবধান,” আমি পাগল গারবিলদের বললাম।
প্রিন্সেস তার মোটা পাছায় দাঁত বসিয়ে দেয়ার ঠিক আগমুহূর্তে রামানুজান সর্পমানবের মুখ থেকে লাফ দিল। প্রিন্সেস তার মালিকের মুখেই দাঁত বসিয়ে দিল।
মারডক চেঁচাচ্ছে।
এই গোলমালের মধ্যে আমি খেয়ালই করিনি যে মারডক নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তার নজর প্রিন্সেসের দিকে, যে সর্পমানবের গোলাপী মাংসল গালে দাঁত ঢুকিয়ে দিয়েছে।
মারডক পিছনের পায়ে ভর দিতেই আমি পথ থেকে সরে গেলাম।
সে ঝড়ের বেগে আমাকে কাটিয়ে সামনে লাফ দিল।
আমি দেখলাম তার চোয়াল খুলে গেল, পাঁচ ইঞ্চি, আট, সম্ভবত পুরো দশ ইঞ্চি, তারপর প্রিন্সেসের মাথার উপর বন্ধ করল।

এক মুহূর্ত পর, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি মারডক সেখানে ফিরে আসল। পাঁচ ফুট লম্বা অজগরের অবশিষ্টাংশ তার দাঁতে ধরা।
আমি দুই কদম সামনে এগোলাম। তারপর সর্পমানবের পাশে হাটু গেড়ে বসলাম। সে চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে। সে কোকাচ্ছে। প্রিন্সেস সর্পমানবের মুখের অনেকখানিকই কামড়ে ধরেছিল। তার নাক, উপরের ঠোঁটের অর্ধেক অংশ এবং ডান গালের কিছু অংশ আর নেই। তারা এখন ঝুনঝুনিটার সাথে মারডকের পেটে অবস্থান করছে।
আমি বন্দুক আর মোবাইল ফোন তুলে নিলাম।
৩:৫৯ এ.এম।
আমার আর ষাট সেকেন্ড বাকি থাকতে পারে। কোন সময় নাও থাকতে পারে।
ইনগ্রিড এখনো লাইনে আছে।
আমি বসে পড়লাম। “ইনগ্রিড।”
“হেনরি? তুমি ঠিক আছ?”
“সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তোমরা আসতে পা–”

...
হাসপাতালে যাওয়ার পথে ক্যানডেস মারা গিয়েছিল। দুইবার। সৌভাগ্যবশত, প্রতিবারই তারা পুনরায় তার হৃদপিন্ড চালু করতে পেরেছিল। সে এখন আমার থেকে একতলা উপরে আইসিইউতে আছে। ইনগ্রিড বলেছে, তার অবস্থা আশঙ্কামুক্ত এবং সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। ডা. ইভান্সের গায়ে যে গুলিটি লেগেছে সেটি একটুর জন্য তার ডান ফুসফুসে লাগেনি। তিনি আমার কয়েকরুম পরেই আছেন। আমার কপালে দশটা সেলাই লেগেছে। এবার নিয়ে সাতবার হল। আমি নার্সকে জিজ্ঞেস করেছি আমি কোন পাঞ্চ কার্ড পেতে পারি কিনা। যখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি, আমি সামনের দিকে পড়ে যাই, আর আমার মাথা টাইলস এর মেঝেতে আঘাত করে। যা ঘটেছে, এর থেকে অনেক খারাপ কিছুও ঘটতে পারত। যেমন সর্পমানবের কথা ধরা যায়। সে গারবিলের আক্রমনের স্বীকার হয়েছে, তার নিজের সাপের কামড় খেয়েছে, আর তারপর তার মুখের অর্ধেক কুকুরে খেয়ে

ফেলেছে। আর এটা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না যে, সে দীর্ঘ সময়ের জন্য জেলের ঘানি টানতে যাচ্ছে। সান্তনার বিষয় হচ্ছে, জেলখানায় কেউ তাকে ঘাটাতে যাবে না। ঐরকম মুখ দেখার পর তো নয়ই। অথবা একদমই মুখ না থাকায়।

ইনগ্রিড আমার বিছানার পাশে চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে। আমি তাকে দোষ দিতে পারি না। সে বিগত প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে জেগে ছিল। প্রথমে পশু হাসপাতালের অভিযান, তারপর ক্যানডেস আর ডা. ইভান্সের সার্জারীর তদারকি। গতকাল আমি যখন প্রথম জেগে উঠি সে আমার পাশেই ছিল। সাধারণ মেয়েদের মতই সে কেঁদেছিল, আর গোয়েন্দা অফিসারদের মত বলেছিল আমি নিজের মৃত্যুর জন্য যেন আর চেষ্টা না করি।

আমি কথা দিয়েছি।

আমার রুমের দরজা খুলে গেল।

"হাই, আব্বু," আমি ফিসফিস করে বললাম।

"হাই, খোকা," দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন। তার মাথায় অল্প যে কিছু চুল আছে তা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে। নাকের ওপর বিশাল চশমা। "মাথার কি অবস্থা?"

"ভাল, ওরা বলেছে কালকে বাড়ি যেতে পারব।"

তিনি মাথা ঝাঁকালেন।

"আমার সাথে কয়েকজন এসেছে যারা তোমার সাথে দেখা করতে চায়।" তিনি দরজা খুলে ধরলেন।

আমি উঠে বসলাম।

মারডক মার্চ করে আসল। ল্যাসি, বিলি আর রামানুজান অভিজাতদের মত তার পিঠে বসে আছে, যেন মিশরের তিনজন রাজপুত্র।

আমি হাসতে শুরু করলাম। হঠাৎ আমার মাথায় একটা প্রশ্ন চলে আসল।

"তুমি ওদের এখানে ঢুকালে কি করে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার নিজের পদ্ধতিতে," তিনি হাসতে হাসতে বললেন। রাতের শিফটের নার্সের নাম রোক্সেটি, সে আমার বাবাকে পছন্দ করে।

ল্যাসি মারডকের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে আমার বিছানায় চলে আসল। সে আমার

বুকে উঠে পড়ল।
মিয়াও।
“এখনো ওগুলো কেনার সময় পায়নি।’
মিয়াও।
“আমি কথা দিচ্ছি অবশ্যই কিনে দিব।”
মিয়াও।
“দশটা, হ্যা, দশটা।”
মিয়াও।
“আর ক্যাভিয়ার।”
মিয়াও।
“হ্যা, কালো। আমাদের চুক্তির কথা আমার মনে আছে।”
সে এগিয়ে এসে আমার নাক চেটে দিতে লাগল।
মিয়াও।
“আমিও তোকে ভালবাসি।”
তারপর সে বিছানা থেকে লাফ মেরে ইনগ্রিডের কোলে গিয়ে বসল।
মারডক আমার বিছানার কাছে সরে আসল। বিলি আর রামানুজান তার গলাকে ব্রিজের মত ব্যবহার করে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
“আমার প্রিয় দুই আত্মগোপনকারী।”
তারা দুজনেরি তাদের গোঁফ নাড়তে থাকল।
“তোমরা খুবই ভাল। দেখে মনে হচ্ছিল মিশন ইমপসিবল মুভির কোন দৃশ্য।” ইসাবেলের নিয়ে আসা স্যান্ডউইচের বাকি অংশ তুলে নিলাম। এটা ক্যালিফোর্নিয়া ক্লাবের স্যান্ডউইচ। তারপর তাদের দুজনকেই একটু করে বেকনের টুকরা দিলাম। তারা দ্রুত খেয়ে ফেলল।
“তুমি ওদেরকে পুষবে একথা বোলো না,” আমি বাবাকে বললাম।
বাবা মাথা নাড়ল। “না, আমি ভেবেছিলাম ওগুলোকে তুমিই নিতে চাবে।”
আমি দুইজনকে ভালভাবে দেখে ল্যাসির দিকে তাকালাম।
আমি যেন কল্পনায় দেখতে পেলাম ওরা তিনজন মিলে কি কি ভয়ংকর কাজ করতে

পারে।
“কখনোই না,” আমি বললাম। “না, আমার মনে হয় তারা পশু হাসপাতালের ছাদে বেশ সুখেই আছে।” আমি তাদের দুজনকেই এক টুকরা করে রুটি দিলাম। “ইনগ্রিডকে দিয়ে কালকে ওদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করব।”
“আর এই যে তুই,” আমি মারডককে বললাম।
সে আমার মুখ চেটে দিল।
“তুই না থাকলে আমরা এই বিপদে পড়তামই না।” আমি ঘুরে ল্যাসির দিকে তাকালাম। সে এখন ইনগ্রিডের বুকের মাঝে মাথা গুজে দিয়ে আরাম করছে। “সত্যি বলতে কি, আমি তোকে কোন দোষ দিচ্ছি না। তুই শুধুমাত্র ঐ ছোট শয়তান বিড়ালটাকে খুশী করতে চেষ্টা করেছিস।”
আমি অনেকক্ষণ ধরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। “আর তোর ঐ ইস্পাতের মত পাকস্থলীর জন্যই সবাই বেঁচে গেছে। তুইই আসল নায়ক।”
এতে লজ্জা পেয়ে সে তার লাজুক হাসি হাসল। যেন বলতে চাইল, ‘কে? আমি?’
আমি তার বিশাল নাকে চুমু খেলাম।
“তাহলে,” বাবা পকেট থেকে তাসের প্যাকেট বের করতে করতে বলল, “হয়ে যাক এক হাত?”
আমি মাথা নাড়লাম।
“ডিল কর।”
“আমি বেশ কিছু নতুন জিনিস শিখেছি।”
আমি হাসলাম। “হ্যা, আমিও নতুন কিছু শিখেছি।”
“যেমন?”
“যেমন, তোমার সামনের জন্মদিনে আমি তোমার সাথে মারডককেও পাঠিয়ে দেব।”
“আর ডগ-সিটিং করবে না,” আমাকে দুটি কার্ড দিতে দিতে তিনি বললেন।
আমি হাসতে হাসতে মাথা ঝাঁকালাম। “আমার অত সময় নেই।”